

এবং প্রান্তিক

An International Research Refereed Journal

DIIF Approved Impact Factor : 1.83

Issue 3rd Vol. 8th January, 2016

সম্পাদক

আশিস রায়

E:\ebong prantik logo.tif

EBONG PRANTIK

Ebong Prantik

An International Research Refereed Journal

Editorial Board

**Executive Editor**- Prof.Bratati Chakravarty.

**Editor-** Ashis Roy.

**Co-Editor**-Tumpa Bapari, Asish Kr.Sau, Sujay Sarkar.

**Advisory Board** – Bibhabasu Dutta, Biswajit Karmakar, Soma Mukherjee, Akash Biswas, Tapas kumar Sardar, Mrinmoy Paramanik, Md.Intaj Ali, Mohankumar Mayra.

**Expert Members**-

Dr.Alok Ranjan Dasgupta (Hedelberg University)

Dr.Ujjal Kumar Mazumdar (Calcutta University)

Dr.Achinta Chatterjee (California University)

Dr.Alokesh Dutta Roy (Scientist/Pharmaceuticals, Boston)

Dr.Manas Majumdar (Calcutta University)

Dr.Subal Kumar Maity (Ex-Scientist, Min. of Ayush)

Dr.Tarun Mukhopadhyay (Calcutta University)

Dr. Sanat Kumar Naskar (Calcutta University)

Dr.Soumitra Basu (Rabindra Bharati University)

Dr.Srutinath Chakraborty (Vidyasagar University)

Dr. Shrabani Pal (Rabindrabharati University)

Dr.Sandip Kumar Mandal (Presidency University)

Dr. Uttam Kumar Biswas (Presidency University)

Dr.Sambhunath Bandyopadhyay (Burdwan University)

Dr.Tania Hossain (Waseda University)

Dr.Soumitra Shekhar (Dhaka University)

Dr.Aloka Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Namita Bhattacharya (Banaras Hindu University)

Dr.Prakash Kumar Maiti (Banaras Hindu University)

Dr.Sumita Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Samaresh Debnath (Dhaka University)

Dr.Bhuina Iqbal (Chattagram University)

প্রচ্ছদ শিল্পী- তাপস রায়।

ISSN : 2348-487X

প্রকাশ : ১৫ ই জানুয়ারী, ২০১৬

মূল্য : ১৫০ টাকা

\* লেখার দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোন অংশের কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

সূচীপত্র

|  |  |
| --- | --- |
| আধুনিক বিশ্ব ও রবীন্দ্রনাথের মূল্যবোধের জগৎ/ ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার | ১ |
| শিবরাম চক্রবর্তী ও বাংলা সাহিত্য/ ড. মানস মজুমদার | ১১ |
| বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা : একটি পর্যালোচনা/  ড. ব্রততী চক্রবর্তী | ১৯ |
| শিশু ও কিশোরসাহিত্য সুনির্মল বসু/ ড. সনৎকুমার নস্কর | ২৭ |
| সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি ছোটগল্প : ক্ষুধার্ত আর নামহীনদের মিছিল/ ড. শ্রাবনী পাল | ৪১ |
| দেশভাগ ও সমকালীন সংকট : বাংলা ছোটগল্প/ ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস | ৫৫ |
| রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ : একটি ভিন্নপাঠ/ ড. বিভাবসু দত্ত | ৬৭ |
| সুধীন দত্তের ‘উঠপাখী’ অথবা প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থের সাধনা/  ড. আকাশ বিশ্বাস | ৭৯ |
| জীবন যন্ত্রনায় অন্তর্জলি যাত্রা/ ড. নিত্যানন্দ মন্ডল | ৯১ |
| আসাদ চৌধুরীর কবিতা : বহুবিস্তৃত অর্থের দ্যোতনা/ মামুন রশীদ | ৯৭ |
| মাঝিদের জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস : পদ্মানদীর মাঝি ও তিতাস একটি নদীর নাম/ তাপস রায় | ১০৩ |
| ভাষা আন্দোলন ও আবুল বরকত : একটি বিশ্লেষণ/  ড. এস.এম. সারওয়ার মোর্শেদ | ১০৮ |
| প্রতিবাদী নারী ভাবনায় কবি কৃষ্ণা বসু/ রূম্পা ভদ্র | ১২১ |
| Le thème, l’histoire, les personnages et la forme des quatre romans de François Mauriac /Dr.Bratish Sarkar | ১৩৬ |

সম্পাদকীয়

পেরেকে ঝুলছে সময়। সময় মানে দিন, তারিখ, মাস এইসব। অতীতকে তো খুবলে খেয়েছে উদরিক সময়। বর্তমানের প্রয়াণ প্রস্তুতিও তারই হাতে। ভবিষ্যৎও কি তবে ... । বেলাশেষের গেরুয়া আলোয় দৃষ্টি স্নান সেরে পৌরাণিকের সামনে হাঁটু মুড়ে বসার সময় এখন। আত্মসমর্পণ নয়। নিমগ্ন প্রত্যয় সাধন। অনর্থক অবয়বের রূপকার হয়ে তরঙ্গ ছুঁতে চাওয়ায় কি এমন বাহাদুরী ? শঙ্খ লাগা সময়ের অবাক করা খেলায় অদ্ভুতভাবে গা ভাসিয়েছি আমরা। ‘সম্পর্ক’ আজ ভয়ে ভয়ে বেড়ে ওঠে। ছিঁড়ে যাওয়ার ভয়ে, ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে। কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক, পাঠের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্কের কোন ভেদ নেই। সম্পর্কের এই সরলতম ফর্মুলা যেন প্রত্যেক পাঠকের রক্তে খেলা করে। সময়ই সেই শ্বাশত রূপকে বহন করে চলে।

আধুনিক বিশ্ব ও রবীন্দ্রনাথের মূল্যবোধের জগৎ

ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

।। ১।।

জীবনের নীতি নির্ধারণে এবং জীবনযাপনে ও জীবিকার ক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ডের চেতনা আমাদের মনে কাজ করে। এই চেতনার অনেকটাই আমাদের শৈশব কৈশোরের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পারিবারিক ধ্যান-ধারণা থেকে আসে। কিছুটা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো বিস্তৃত সামাজিক পরিবেশ থেকেও আমরা অর্জন করি।

এই রকম খানিক পাওয়া, খানিক অর্জন করে নেওয়া অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের নৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে। এই নৈতিক চেতনাকেই অন্যনামে বলতে পারি ‘মূল্যবোধ’। এই মূল্যবোধ নিয়ে আমরা যেমন বেঁচে থাকি, তেমনই জীবনের মানকে পাল্টানোর চেষ্টাও করি। জীবনযাপন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো উন্নত করার আশাতেই আমরা সে চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথের জীবনযাপন ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বেশ কিছু মূল্যবোধকে রূপ দেবার চেষ্টার মধ্যে আধুনিক বিশ্বের সমস্যা সমাধানের কিছু জরুরি হাতিয়ার থেকে গেছে। সেগুলি যে কতোখানি জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করি।

।। ২ ।।

রবীন্দ্রনাথের মূল্যবোধ গড়ে ওঠার জগতে তাঁর ধর্মবোধ ও মানববোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। এই বোধ তাঁর একদিনে গড়ে ওঠেনি। ধীরে ধীরেই বিবর্তনের পথে গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকে ধর্ম সংস্কার ও ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি যে গ্রহণ বর্জনের যুগোপযোগী প্রয়োজনীয়তাকে মানতে বাধ্য হয়েছিল সেই আবহাওয়াতেই তখনকার শিক্ষিত শ্রেণী নিজেদের যুক্তি বুদ্ধি মতো খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেছিলেন। ঠাকুর পরিবারে যে সংস্কৃতিতে বৈদিক সংস্কৃতি, ইসলামি সংস্কৃতি (হাফেজের অনুবাদ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ) এবং কানফুসিয়াসের বাণীর সমন্বয় ঘটেছিল সেই আবহাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও যৌবন কেটেছে। যৌবনে ব্রাক্ষ্ম সমাজে আচার্য হয়েও যে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তার প্রতি আনুগত্য তাঁর সারা জীবন একই রকম ছিল না। কিন্তু পরমাত্মাকে আত্মার মধ্যেই পাওয়া যায়, এই বোধকে রবীন্দ্রনাথ জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতি হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। এবং এই সিদ্ধান্ত আসার পথে বৌদ্ধধর্ম ও মধ্যযুগের সাধক কবির, নানক, দাদূ, রজ্জব ইত্যাদি মর্মস্পর্শী উদার মানবিক বাণী অনেকখানি সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে মানববাদী নানা চিন্তার স্রোতে প্রতিস্রোতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৌলিক ঔপনিষদিক চিন্তাকে নিয়ে এলেন মন্ত্রহীন ব্রাত্যতায় (পত্রপুট, ১৫), সমস্ত রকম উপাসনা মন্দিরের বাইরে। মনের মানুষের জ্যোতির্ময় জগরণে। যদিও মানুষের ধর্ম ব্যাখ্যায় তিনি উপনিষদকে নির্দ্ধিধায় ব্যবহার করেছেন এই মনের মানুষেরই উন্মোচনের সহায়ক হিসেবে। আর যেটা তাঁর চিন্তার একটা বড় বৈশিষ্ট্য, সেটি হল এই মনের মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘বিশ্বমন’ ‘Universal mind’ : ‘আমার মন আর বিশ্বমন একই, ভাষান্তরে সোইহম্‌।’ সোইহম্‌-এর ব্যাখ্যা একেবারেই তাঁর নিজস্ব। মানুষ আর মহামানব, একক মন আর বিশ্বমন এদের সহযোগকেই মানব-ইতিহাসের লক্ষ্য হিসেবে তিনি দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানব চর্চা আনুষ্ঠানিক মন্ত্রচর্চা থেকে বিশ্বমানববোধের উপলব্ধিতে একটি গভীর ও স্থায়ী মূল্যবোধে পৌঁছেছে যার প্রাসঙ্গিকতা দিনে দিনে এই আধুনিক সংকুচিত বিশ্বে- এই বিশ্বায়নের যুগে ক্রমশ বেড়ে গেছে বলেই আমার ধারণা। মেন রাখতে হবে, একান্তভাবে বিবর্তনের পরিণতি হিসেবেই এসেছে।

।। ৩ ।।

রবীন্দ্রনাথের এই মানব-চর্চা নিছক তাত্ত্বিক চর্চার স্তরেই থাকেনি। কারণ, মানুষকে নিয়েই তিনি শেষ চল্লিশ বছর পরীক্ষা করেছেন। এবং তারও আগে থেকেই ঔপনিবেশিক পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রমবিস্তারে দেশীয় সমাজ-রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রথম যুগে ইংরেজ-বিদ্বেষের আক্রমণ মত্ততা থেকে সরে আসার পেছনে রবীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব মূল্যবোধ কাজ করেছিল। সে হল ‘জাতীয় ঐক্য’- তাঁর ভাষায় ‘সামাজিক সম্মিলন।’ তাঁর ধারণায় এই সম্মিলনের মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান ইত্যাদি সকলেই সামাজিক সংহতির মধ্যে বাস করবে। এই সংহতিবোধকে বাদ দিয়ে উগ্র দেশীয় মনোভাবকে (এখানকার রাজনীতির ভাষায় যাকে উগ্র হিন্দুত্ব বা ইসলামি মৌলবাদ বলা হয়) ইউরোপীয় ন্যাশানালিজম-এরই নামান্তর বলে তিনি মনে করতেন। ১৩০৫ থেকে ১৩০৮ সালের মধ্যে ‘ধর্মতন্ত্র’ ভিত্তিক মূঢ় আন্দোলনের নগ্ন প্রকাশ দেখে বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি যা লিখেছিলেন তাতে তাঁর সেই ভারতীয় মূল্যবোধ এখনও কী ভীষণ প্রাসঙ্গিক তা বুঝতে পারা যায় – ‘আজ হিন্দুজাতি জ্ঞানে-অজ্ঞানে আচারে-অনাচারে বিবেকে এবং অন্ধকুসংস্কারে এমন একটা অদ্ভুত মিশ্রণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! - যদিও আমরা বহুসংখ্যক আর্য অনার্য এবং সংস্কার জাতি ‘হিন্দুত্ব’ নামক এক অপরূপ ঐক্য লাভ করিয়াছি, তথাপি আমরা যেমন এক তেমনই বিচ্ছিন্ন ... এই দেবদেবী, বিচিত্র পুরাণ এবং অন্ধ লোকাচার-সংকুল আধুনিক বৃহৎ বিচারের নাম হিন্দুত্ব।’ (রাজাপ্রজা, ১৯০৫)।

প্রায় বছর সাতেক বাদে একটি প্রবন্ধে (পরিচয়, ১৩১৯/১৯১২) বলেছেন – ‘হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম নহে, হিন্দু ভারতবর্ষের এক জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ এক আলোক এক ভৌগলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ প্রতিঘাত-পরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়ে, আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।’

এখনকার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ‘হিন্দু ভারতবর্ষের এক জাতিগত পরিণাম’- এই মন্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুত্বের যে ঐতিহাসিক মূল্যবোধ রবীন্দ্রনাথ পোষণ করতেন এই মুহূর্তে সেই মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে পোষণ করেন না। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানব-ধারণা যেমন এই মুহূর্তে খুবই প্রাসঙ্গিক, তাঁর এই ‘হিন্দু’ধারণাও আর একটি মৌলিক মূল্যবোধ। তিনি এই সূত্রে আরও বলেছেন, ‘হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রিষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না, এইখানে তাহার একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অ-হিন্দু হইবেনা, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।’ এই সামগ্রিক ভারতীয়বোধই তাঁর ‘গোরা’ উপন্যাসে গোরা-র বিচিত্র বিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

।। ৪ ।।

স্বদেশী যুগ থেকেই ভারতবর্ষকে যেমন মহাজাতির উদার মিলনক্ষেত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তেমনই ভারতীয় সমাজ জীবনের মূল কেন্দ্র যে পল্লীসমাজ সেই পল্লীসমাজের পুনর্গঠন-যাতে চিন্তাই করেছেন বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে ভারতীয় উদার মূল্যবোধে তিনি আস্থাশীল সেই উদারতা একটা শক্তিশালী ও সংহত ভিত্তি পেতে পারে, আর এই পল্লীপুনর্গঠনের সূত্রেই দারিদ্রের ভাবনা, অশিক্ষার ভাবনা ও স্বাস্থ্যের ভাবনা তাঁকে বিচলিত করেছে। মনে রাখতে হবে, প্রায় একশো বছর বাদে, স্বাধীনতার প্রায় ষাট বছর বাদেও আমাদের দেশের প্রশাসন ও অর্থনীতিচিন্তায় এই তিনটি মূল ভাবনা।

বছর তিরিশ বয়স থেকেই জমিদারির অভিজ্ঞতায় এই ভাবনা শুরু। তারপর থেকে যতদিন গেছে ততই পল্লীগ্রামের জীবনে আত্মনির্ভরতা, গণসংযোগ ও গঠনমূলক স্বদেশ-সেবার কাজ থেকে তিনি সরে আসেন নি। কিন্তু ‘স্বদেশ প্রেমিক’-দের স্বদেশের চেয়ে প্রেমকেই বেশি প্রাধান্য দিতে দেখেছেন। স্বদেশের মানুষদের ওপর তাঁদের নজর কম বলে বিদ্রুপ করেছেন। এবং দেখেশুনে শেষ পর্যন্ত সমাজ সংহতি ও উন্নতির পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে তিনি একটি ছোট গ্রামকেই ইউনিট হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আর সেই ছোট গ্রামের সমস্ত মানুষকে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কাজে নিয়োগ করতে চেয়েছেন। গ্রামের সব স্তরের সব শ্রেণীর মানুষ যদি যৌথ জীবন গড়ে তোলার শিক্ষা পায় তাহলে সেখানেই জাত-পাতের সমস্যা এবং বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠীর মতান্তর মিটতে পারে, বা মিটবার মনোভাব তৈরি হতে পারে। আর সেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই বৃহত্তর ক্ষেত্রে জেলা স্তরে, প্রদেশ স্তরে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সমস্যা ঘনিয়ে উঠলে তার সমাধানও হতে পারে। একটি ছোট ইউনিটের মধ্যে সামাজিক সাম্যবোধের ধারণাকে গড়ে দিতে পারলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতীয় সংহতির মূল্যবোধ তৈরি হতে পারে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করতে করতে ভাষাগত বিনিময় এবং অনুভবগত সাম্যবোধ বা ইমোশানাল হারমনিও আসে যা কিছু স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেতা বা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী সহজে নষ্ট করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, সংহতি নষ্ট করার জন্যে ‘তথাকথিত শিক্ষিত’ মানুষেরই বেশি সক্রিয়। এই সক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করার জন্য ছোট ছোট ইউনিটে কাজ করে সামাজিক সাম্যবোধ গড়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট ছিলেন।

।। ৫ ।।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার কথা এসে পড়ে। তাঁর মতে শিক্ষাবিস্তার ঘটিয়ে শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে ভেদ ঘুচে গেলেই শিক্ষা শেষ হয় না। শিক্ষার সঠিক অর্থ বুঝতে হবে। আর্থিক-বৈষম্য দূর করে এবং ব্যাপকভাবে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে শিক্ষাকে সদর্থক সামাজিক শক্তিতে পরিণত করতে হবে। তবেই সংহতি আসবে। কিন্তু সংহতি মানে সমস্ত কিছু একাকার হয়ে যাওয়া নয়। ‘শিক্ষার মিলন’ প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন ‘একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। ... সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে।’ নবযুগের যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন – ‘ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে। আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতি বিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।’ সংহতির সূত্রে স্বাতন্ত্র্যে ও ঐক্যের চিন্তায় তাঁর মূল্যবোধ জাতিগত সীমাবদ্ধতা ছড়িয়ে বিশ্ববোধের দিকেই ঝুঁকেছিল। বিশ্বায়নের চিন্তা তিনি অনেক আগেই করেছিলেন। ‘Man’ নামে যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন অন্ধবিশ্ববিদ্যালয়ে (ওয়ালটেয়ারে ১৯৩৩ সালে) তাতে সকল কালের সব মানুষের ব্যক্তিমন গুলির সমন্বয়ে এক ‘বিশ্বমন’ বা ‘ইউনিভার্সাল মাইন্ড’- এর কথা বলেছিলেন যাকে তিনি ‘Man’ বা মানবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলেই মনে করতেন।

।। ৬ ।।

নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে, বিশেষভাবে নারীবাদীদের বিচিত্র সব আলোচনা তর্ক-বিতর্ক চলেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনায় নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে একটা বিবর্তন চোখে পড়ে। প্রথম দিকে নারী ও পুরুষের মানসিকতা ও কর্মক্ষেত্র আলাদা ভাবেই দেখছেন তিনি। এমনকি “চিত্রাঙ্গদা”র মধ্যেও তিনি শেষ পর্যন্ত পুরুষের পার্শ্বচরী হিসেবেই নারীকে দেখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্বে, বিশেষ করে বিদেশে (জাপান যাত্রী, ১৯২৪), সমাজে মেয়েদের স্পষ্ট ও স্বাধীন ভূমিকা দেখে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই ম্পাল্টে যায়। “কালান্তর” এ সংকলিত ‘নারী’ প্রবন্ধে তিনি বলছেন, ‘ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর একটি ভেদ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে চলছে’। তাঁর ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতার মেয়েটি শেষ পর্যন্ত এক অসাধারণ প্রতিভাময়ী হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে বিদূষী ও নারীর আকর্ষণী শক্তি দিয়ে। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমাজ দর্শনে বিরোধের চেয়ে, প্রতিযোগিতার চেয়ে, সহযোগিতায় বড় হয়ে উঠেছে। আর এই সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নর-নারী, সম্পর্ককে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। এই মুহূর্তে নারীবাদীদের ঝোঁকটা প্রতিযোগিতার দিকেই। পুরুষ-প্রধান সমাজে যে সংগ্রাম করেই মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে হচ্ছে তাতে এটা স্বাভাবিক বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের কথা ভাবলে নারী-পুরুষ এই দুটি ভিন্ন ‘সম্প্রদায়’ তাদের সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ভুলে একটা সামগ্রিক সামাজিক শক্তি হিসেবেই দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কর্মের শেষ পর্বের মধ্যে যে সহযোগিতার দর্শন ফুটে উঠেছে তা ভবিষ্যৎ সমাজে কি শহরে কি গ্রামে নর-নারীর সুস্থ সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা চিন্তা সহায়ক ও প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়।

।। ৭ ।।

ভারতীয় সমাজের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে কাজের সূচনা হিসেবে প্রথমে যে ছোট একটি ইউনিটই বেছে নিতে হবে রবীন্দ্রনাথের এই ধারনার কথা আগে বলেছি। সামাজিক সাম্যবোধ ও সংহতির শিক্ষা এখানেই হবে। কিন্তু পল্লী সমাজের প্রশাসনের স্বরূপটা কেমন হবে তার একটু অনুপূঙ্খ চেহারাও তিনি দিতে চেয়েছিলেন যার মধ্যে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার একটা সদর্থক ছবি পাই। সেই চেহারা কেমন হবে তার একটা পরিকাঠামোও তাঁর রচনা থেকে পেয়ে যাই।

পল্লীসমাজের মধ্যে তিনি একটি সংবিধান রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সাম্য, বিবাদ-বিসংবাদ মেটাবার সালিশি। স্থানীয় শিল্পের উন্নতির চেষ্টা, বয়স্ক শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয়, পানীয় জল, পথ ঘাট, সৎকার স্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যবস্থা, আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে বা খামার স্থাপন, গো-মহিষাদি পালনের উপযোগী শিক্ষাদান, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যে ধর্মগোপালের ব্যবস্থা, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি যা যা ছিল তাতে সামগ্রিক পল্লী জীবনের মান উন্নয়নের দূর দৃষ্টি ছিল। এই সব চিন্তা ভাবনার ভিত্তিতে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার যদি ব্যর্থ হয়েও থাকে তাহলেও এই ব্যর্থতাও পরবর্তীকালের শিক্ষার অঙ্গ হয়ে থাকবে। আর ব্যর্থতার দায় তো আমাদেরই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়।’ এখন তো দেখছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অমর্ত্য সেনের কাছে নতুন করে দারিদ্র্য-দূরীকরণের পরামর্শ নিচ্ছেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাঁর উদ্বেগ দেখে অমর্ত্য সেনের প্রবর্তিত প্রতীচী ট্রাস্টের সাহায্যে সমীক্ষাও চলেছে দারিদ্র্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারও এখন উদ্বিগ্ন হয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। মনে রাখতে হবে, দারিদ্র্য দূরীকরণের অর্থনীতির প্রাথমিক পাঠ শ্রীনিকেতনে ১৯২৫ সালে প্রায় আশি বছর আগে সমবায়িক গ্রামীণ তথ্যসংগ্রহ থেকে অনেকখানি পাওয়া যাবে। সে সব তথ্য সংগ্রহ এখন কাজে লাগবে না ঠিকই, কিন্তু পদ্ধতির একটা পূর্বকাঠামো তো নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

।। ৮ ।।

এই পল্লীপুনর্গঠনের চেষ্টার পাশাপাশি আর একটি যে মূল্যবোধ কাজ করেছিল সেটি আরো ব্যাপক ও গভীর। পাশাপাশি বলছি ঠিকই কিন্তু পল্লী পুনর্গঠনের পরিকল্পনার মধ্যেই সে মূল্যবোধ কাজ করছিল। এবং তা পল্লীজীবন ছাড়িয়ে সামগ্রিকভাবে সুস্থ জীবনযাপনের ভাবনার মধ্যেই পড়ে। সাম্প্রতিক কালে যাকে আমরা পরিবেশ ভাবনা বা Environmental Problem বলি। এ সমস্যা সারা বিশ্বে মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের ভাবনারই সমস্যা কলকাতার বাইরে শিলাইদহের আশেপাশে পদ্মার বিস্তৃত চরে জীবন কাটাতে কাটাতে এবং শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকতনে লাল কাঁকুড়ে রুক্ষ ভূপ্রকৃতির মধ্যে নিজের স্বপ্নকে রূপ দিতে দিতেই রবীন্দ্রনাথের মনে এই পরিবেশ ভাবনা গড়ে ওঠে। তারও আগে কলকাতাতেই গঙ্গার দুটি তীরের সবুজ শান্তি হারিয়ে যাওয়ার জন্যে দুঃখবোধ তীব্র হচ্ছিল। মানুষকে তিনি আর স্বতন্ত্রভাবে মানুষ হিসেবে দেখতে চাইছিলেন না। সমস্ত ভূ-প্রকৃতির ভারসাম্যের মধ্যে মানুষকে একটি অন্যতম প্রাণী হিসেবে ভাবছিলেন। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জৈবসত্তা হিসেবেই ভাবছিলেন না। প্রকৃতি-প্রেম-নয়, প্রকৃতিরই অন্তর্গত একটি সত্তা প্রাকৃতিক ভার সাম্যই যে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকে এই চিন্তা থেকেই মানুষের শিক্ষার অন্তর্গত প্রকৃতি পাঠকে তিনি অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। মানুষ তো বটেই, সমস্ত প্রাণী জগতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশ রক্ষা করাটা বৈজ্ঞানিক দিক থেকেও যে অপরিহার্য এ চেতনাটা রবীন্দ্রনাথের মনে একটা গভীর মূল্যবোধ হিসেবেই নিহিত ছিল।

এই মূল্যবোধ তাঁর কৈশোর যৌবনের পারিপার্শ্বিক থেকে যেমন জেগে উঠেছে, তেমনি শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন গঠনের কাজে অর্জিত অভিজ্ঞতাও বটে। আবার বলছি, শুধু প্রকৃতি-প্রেম নয়, জীবন-বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে জৈব প্রয়োজনের আবশ্যিক হিসেবে উপলব্ধি করাটা তিনি শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। ঋতু উৎসব থেকে শুরু করে শারদোৎসব, মুক্তধারা, এমন কি রক্তকরবী নাটকের বহুমুখী তাৎপর্যের মধ্যে, এবং বনবাণী-র প্রকৃতি ও প্রাণ-বৈচিত্র্যের মধ্যেও প্রকৃতি ও জীবনের অভিন্নতাকে তিনি বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ‘বলাই’ গল্পের বলাই-এর চোখ দিয়ে দেখলে দেখা যায়, ‘রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনা-রঙের রোদ্দুর দেবদারু বনের উপর এসে পড়ে \_ ও কাউকে কিছু না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারু বনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছম ছম করে – এই সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষ ও যেন দেখতে পায়; তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই জানে। তারা যেন অনেক কালের দাদামশায়, ‘এক যে ছিল রাজা’দের আমলের।’ অর্থ্যাৎ একই প্রাণের উৎস থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ আর প্রকৃতি তখন একাকার হয়ে যায়।

প্রাণধারণের জন্যে প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি শ্রীনিকেতনের বার্ষিক সম্মেলনে তাঁর শেষ বক্তৃতায় (১৯৩৯) রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, অরণ্যচর মানুষ ধীরে-ধীরে যখন নগরবাসী হল তখন সে তার প্রথম বন্ধু অরণ্যকে হারাল। দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে সে নির্মমভাবে আক্রমণ করল। তার ইঁট কাঠের বাসস্থান তৈরি করলে। বন লক্ষ্মীর আশীর্বাদকে অবজ্ঞা করে সে অভিসম্পতি দিলে। তার ফলে মরুভূমিকেই সে ডেকে এনেছে। আরও বলেছিলেন, ভারতবর্ষের উৎস-অংশ তরুবিরল হয়ে পড়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমেরিকাতে বড় বড় বন ধ্বংস করা হয়েছে। তার ফলে বালি উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। বিধাতা প্রাণ পাঠিয়েছিলেন, চারদিক তার আয়োজন করে রেখেছিলেন, আর মানুষ নিজের লোভে মরণের উপকরণ জুগিয়েছে।

তাই শ্রীনিকেতনে ‘বনদেবতার বেদী’ তৈরি করে আমাদের প্রতিবেশকে ফিরিয়ে আনতে রবীন্দ্রনাথ একটি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। বলেছিলেন, এ উৎসবের দুটি অঙ্গ। প্রথম, হলকর্ষণ। হলকর্ষণ আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য, নিজেদের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্যে। কিন্তু এর ফলে বসুন্ধরার যে ক্ষতি হয় তাপূরণ করবার জন্যেই দ্বিতীয় আর একটি উৎসব বৃক্ষরোপণের আয়োজন। এই বৃক্ষরোপণ-উৎসব এখন সরকারি নামে ‘বনমহোৎসব’। কেউ এখন বলেনা এই উৎসবের ধারণাটা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পাওয়া। হলকর্ষণে ক্ষতি, বৃক্ষরোপণে ক্ষতি-পূরণ। এই ভাষণের শেষ পঙক্তিটি হল এই – ‘কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারিদিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।’

এখন তো সারা বিশ্বে পরিবেশ-আন্দোলন চলছে। ১৯৬২ সালে অ্যামেরিকার এক সমুদ্রজীব বিজ্ঞানী (Marine Biologist) র‍্যাচেল কারসন (Rachel Carson) তাঁর Silent Spring নামে বিখ্যাত একটি বইতে বিনষ্ট পৃথিবীর বিভৎস রূপ দেখিয়ে পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তার তেইশ বছর আগেই শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ-বৃক্ষরোপণ উৎসব ভাষণে এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে গেছেন। কাজেই তাঁর সমকালে শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনের সবুজায়ন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ তো আধুনিক ছিলেনই, বিশেষ অর্থে ‘উত্তর-আধুনিক’ বললেই সঠিক বলা হয়।

যে মূল্যবোধে মানুষে মানুষে সখ্যতা গড়ে ওঠে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি আসে, গ্রামের যৌথ জীবনের সামবায়িক আদর্শে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য দূর হয়, গ্রাম ও নগরের দূরত্ব দূর হয়, নর-নারীর যৌথ সহযোগিতায় সামাজিক শক্তি দ্বিগুণ হয়ে যায়, জাতিতে-জাতিতে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সহযোগিতা চলে, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও মহাজাতির সংহতি দৃঢ় হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা পরিবেশের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, আধুনিক পৃথিবীর বসুন্ধরা-সম্মেলনের (Earth Conference) অগ্রদূত হয়ে সেই মূল্যবোধের ধারক ও রূপকার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আর কোন বড় মণীষীর অস্তিত্ব আমার জানা নেই।

শিবরাম চক্রবর্তী ও বাংলা সাহিত্য

ড. মানস মজুমদার

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙালির জীবনে হাসি ঠাট্টা- মস্করার অভাব কোন দিন ছিল না, আজও নেই। অথচ আজকের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা যেন শুকিয়ে যেতে বসেছে। ভাবলে অবাক হতে হয় বৈকি। এক সময় কীসব ডাকসাইটে লেখক রীতিমত দাপটের সঙ্গে হাসির গল্প, কবিতা, নাটক আর প্রবন্ধ রচনায় মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। একালের লেখকেরা কেন যে এদিকটিকে উপেক্ষা করছেন ঠিক বোঝা যায় না। সকলেই এত সিরিয়াস হয়ে গেলে চলে ?

আসলে হাসির লেখা, লেখা সহজ নয়। যিনি পারেন তিনি সহজেই পারেন, যিনি পারেন না তিনি শতবার মাথা কুটলেও পারেন না। হাসির লেখা পড়ে যদি পাঠকের মনে হাসির ঝিলিক না দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হবে সে লেখা উতরোল না। হাসির লেখা কলমের কুস্তি নয়, কলমের ফুলঝুরি। কাতুকুতু দিয়ে যেমন হাসানো যায় তেমনি কাঁদানোও যায়। হাসির লেখা কিন্তু কাতুকুতু দিয়ে হাসানো নয়, যথার্থ হাসির লেখার আবেদন আরও গভীরে। তার আবেদন চর্মলোকে নয় মর্মলোকে। হাসির লেখক জীবন ও জগতকে দেখেন অত্যন্ত তির্যক দৃষ্টিতে, উল্টো দূরবীনে। জীবনের স্খলন-পতন, ত্রুটি, অন্যায়, অসঙ্গতিকে হাসির লেখন তুলে ধরেন আপাত লঘু ভঙ্গিতে। যেমনটি করেছেন সুইফট তাঁর ‘গ্যালিভারস ট্রাভেলস’ এ কিংবা সারডেনতেস ‘ডন কিখোতে’-তে। ‘লোক রহস্য’-এর ‘ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল, কিংবা ‘হনুমদ্বাবু সংবাদ’ এ অথবা কমলাকান্তের ‘বড়বাজার’ এ বঙ্কিমচন্দ্র এই তির্যক দৃষ্টিরই প্রয়োগ করেছেন। ‘ডমরু- চরিত’ এর ত্রৈলোক্যনাথ কিংবা ‘শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড’ বা ‘চিকিৎসা সঙ্কট’-এর পরশুরামও তির্যক দৃষ্টিতেই জীবনকে দেখেছেন।

শিবরাম চক্রবর্তী ওরফে শিব্রাম চকরবরতি (১৯০৩-১৯৮০) এদিক থেকে একাকী একটি প্রতিষ্ঠান। আট থেকে আশি সকল বয়সের বন্ধু তিনি। কথা ছিল, মালদহ জেলার চাঁচল রাজবাড়ির অধীশ্বর হবেনা। কিন্তু কপালের গেরো, ফস্কে গেল সে সুযোগ। বদলে যা পেলেন তা কিন্তু কম নয়। বাংলা সাহিত্যে হাসির গল্পের রাজা রূপে পরিচিত হলেন তিনি। সদাপ্রসন্ন, সদা হাস্যময় দৃষ্টি তাঁর। কৌতুকের সমুদ্রে যেন বিচরণ করছেন। জীবনের সব কিছুতেই পাচ্ছেন হাসির খোরাক। একশো চৌত্রিশ নম্বর মুক্তারাম বাবু, স্ট্রীটের মেসবাড়ি, কলকাতার ট্রামবাস, পথ চলতি লোকজন, হোটেল রেস্টুরেন্ট, দোকানপাট, স্কুল কলেজর ছাত্র ছাত্রী, নানা বয়সের দম্পতি, চীনে পাড়া, ইংলিশ ম্যান, থানা পুলিশ ইত্যাদি অনেক কিছুই তাঁর কাছে হাসির উৎস হয়ে উঠেছে।

তাঁর অধিকাংশ গল্পের নায়ক তিনি স্বয়ং। নিজেকে নিয়ে তিনি মজা করেছেন। আর আছে কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরিত্র- হর্ষবর্ধন, গোবর্ধন, বিনি, রিনি, ইতু। এদের বহু বিচিত্র কাণ্ডকারখানা নিয়ে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু গল্প। মজাদার মুখরোচক গল্প। অন্তত চার প্রজন্মের বাঙালি পাঠক পাঠিকার মুখে এবং মনে সে সমস্ত গল্প হাসি ফুটিয়েছে। শিবরামের গল্প আমাদের মন ভালো করে দেয়। গোমড়া মুখেও হাসি ফোটায়। আজকাল অনেকে লাফিং ক্লাবের সদস্য হয়ে মনকে ভালো ও তাজা রাখার চেষ্টা করছেন। কোনও প্রয়োজন নেই, নিয়মিত শিবরামের দু একটি গল্প পড়লেই সে উদ্দেশ্য সহজেই সাধিত হবে।

একদা কৈশোরে বাড়ি থেকে পালিয়ে বোহেমিয়ান শিবরাম শহর কলকাতায় একসময় হাজির হন। নানা ঘাটের জল খান। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন তিনি। রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রি করেন। ফুটপথে রাত কাটান। ধনী ব্যক্তির অন্নছত্রের কল্যাণে পেটের ক্ষিধে মেটান। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি জেল খাটেন। অবশেষে ঠাঁই মেলে একশো চৌত্রিশ নম্বর মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের মেস বাড়িতে। ঐ মেস বাড়িটিকে নানা গল্পে অমর করে রেখে যান। ঐ বাড়িটি যেন তাঁর যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।

শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। ‘কবিতা’ ‘নিরুক্ত’ ‘একক’ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। হালকা এবং গভীর দু’ধরণের কবিতাই লিখেছেন। লিখেছেন গদ্য পদ্য উভয় ছন্দেই। তাঁর কৌতুক রসাত্মক কবিতাগুলি অনাবিল হাসির অফুরন্ত উৎস। ‘যথা পূর্বম্‌’ ‘রুবিদে’ ‘আরেক অতিথি’ প্রভৃতি কবিতার কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। ‘যথা পূর্বম্‌’ কবিতার বিষয়বস্তু প্রতিবেশী হরিপ্রাণের বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবন ;

আমাদের প্রতিবেশী শ্রীমান হরিপ্রাণ

পত্নীর অতি বেশি বাধ্য ;

গিন্নীর আগে তিনি সদাই কম্পমান,

খাদকের মুখে যথা পদ্য;

মারধোর খেয়ে হায় কথন প্রাণ হারান,

সাবধান রণ যথাসাধ্য।

বাচন ভঙ্গির প্রখরতায় এবং অন্ত্য মিলের চমৎকারিত্বে ‘রুবিদে’ কবিতাটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে-

ছুরির ফ্লার মত রয়েছে বিঁধে

আমার মর্মমূলে – সেই রুবি দে।

ভোলাও যায় না তারে,

রাখাও তো বেদনারে!

কোনো রূপে কোনোধারে নেই সুবিধে।

ধারালো ছুরির মত সেই রুবি দে।”

পাশাপাশি ‘তুমি’ ‘বায়না’ ‘ইসারা’ ‘মুহূর্তময়ী’ ‘অরণ্যরোদন’ ‘তিলোত্তমা’ ‘হয়তো’ ‘দেশান্তর’ ‘মণিকার প্রতি’ প্রভৃতি রোমান্টিক প্রেমের কবিতাও লিখেছেন। এগুলি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে চিরস্থায়ী সম্পদ রূপেই বিবেচিত হবে। শিবরাম চক্রবর্তীর কাছ থেকে এ ধরণের কবিতা যদি আরও কিছু বেশি পাওয়া যেত। কতদিন আগে লিখেছেন এ সমস্ত কবিতা। অথচ প্রথম আবির্ভাবের মতো এদের অধিকাংশই আজও সমান তাজা ও রসমধুর। ভাবতে অবাক লাগে, সমালোচকেরা যখন ‘কল্লোল’ যুগের কবিদের প্রেম কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন, তখন শিবরাম চক্রবর্তীর এ সমস্ত কবিতাকে এড়িয়ে যান কীভাবে ? দৃষ্টান্ত হিসাবে ‘বায়না’ কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করা যাক-

সময় চলেছে বেগে ঘুর্ণাবেগে স্রোতের মতন-

চলো না বেড়াই ততক্ষণ।

তোমার শীতল হাতে সময় নিথর,

ইতিহাস- ভূগোলের থেমে গেছে ঝড়,

জীবন স্থবির।

পৃথিবী এখানে এসে হোলো বুঝি শেষ।

তোমার নয়ন দুটি অতল গভীর-

সময় সেখানে রহে স্থির;

ভুবন এখানে নিরুদ্দেশ।

কালো সে গহনতলে করিলা গাহন-

নিজেরে হারাই ততক্ষণ।

‘মানুষ’ এবং ‘চুম্বন’ নামের দুটি কবিতার সংকলনে মুদ্রিত হয় তাঁর বেশ কিছু কবিতা। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য ছোটদের জন্যেও তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। সেগুলি কৌতুক রসাত্মক। ‘বাড়িওয়ালার বাড়াবাড়ি’, ‘জন্মদিনের রিহার্সাল’, ‘অমার্জনীয়’, ‘পৃথিবী বানানো’ ‘জমা খরচ’ এবং এর মতো উপভোগ্য কত কবিতাই না তিনি লিখেছেন।

কিন্তু কবিতা লিখে তো সে যুগে টাকা পাওয়া যেত না। অথচ বেঁচে থাকতে হলে, টিকে থাকতে হলে টাকা চাই। পেটের দায়ে তাই গল্প লেখা শুরু করলেন। ‘মৌচাক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হল ‘পঞ্চাননের অশ্বমেধ’। হাসির গল্প। ছোটদের জন্য লেখা। গল্পটির জন্য পত্রিকার সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁকে অগ্রিম কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তারপর থেকে ছোটদের জন্যে অজস্র হাসির গল্প লিখেছিলেন। তিনি বলতেন, ছোটরাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ছোটদের কাছে তাই খুব কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি। ‘মৌচাক’ ছাড়াও ‘মশাল’ ‘সন্দেশ’ ‘রামধণু’ ‘রংমশাল’ ইত্যাদি পত্রিকায় লিখতেন। লিখতেন দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত পূজা বার্ষিকী গুলিতেও।

ছোটদের জন্য বিস্তর লিখেছেন। গল্প সংকলনের সংখ্যাও কম নয়। তালিকা তৈরি শ্রমসাধ্য ও সময়সাধ্য। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন হল- আমার ভালুক শিকার, আমার ভূত দেখা, ইতুর থেকে ইত্যাদি, উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে, এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনি, কলকাতায় এলো হর্ষবর্ধণ, কলকাতার হালচাল, কাকাবাবুর কাণ্ড, কালান্তক নানাফিতা, কৃতান্তের দন্তবিকাশ, কেবল হাসির গল্প, কেরামতের কেরামতি, গদাইয়ের গোয়েন্দাগিরি, গোঁপ নিয়ে টানাটানি, ঘোড়ার সাথে ঘোরাঘুরি, চক্রবর্তীরা কঞ্জুষ হয়, চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন, চুলচেরা শোধবোধ, বেঁচে গেলেন হর্ষবর্ধন, চোরের পাল্লায় চক্‌রবর্তী, টাকা হলেই টাক হয়, তোতাপাখির পাকামি, দাদা হর্ষবর্ধন ভাই গোবর্ধন, ধৃঙলোচনের আবির্ভাব, নাক নিয়ে নাকাল, নিখরচায় জলযোগ, পথ থেকে হারিয়ে, প্রাণকেষ্টর কীর্তি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, ফাঁকির জন্য ফিকির খোঁজা, কথায় কথায় ফ্যাসাদ, ফানুস ফাটাই, ফাস্ট বয়, বক্কেশ্বরের লক্ষ্যভেদ, বন্ধু চেনা বিষম দায়, বর্ষার মাস, বাজার করার হাজার ঠেলা, বিনির কাণ্ডকারখানা, বিশ্বপতি বাবুর আশ্বত্ব প্রাপ্তি, ভাগ্নে যদি ভাগ্যে থাকে, ভুতুড়ে অদ্ভুতরে, মন্টুর মাস্টার, মাথা যদি নিরেট হয়, যত খুশি হাসো, যত হাসি তত মজা, যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধণ, রসময়ের রসিকতা, লেজের প্রিভিলেজ, হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন, হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি, হাওড়া থেকে আমতা রেল দুর্ঘটনা, হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি, হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ। শিবরাম চক্রবর্তীর মতো কথা বলার বিপদ, শুঁড়ওলা বাবা ইত্যাদি। শিবরামের অনুপ্রাস প্রীতির পরিচয় তাঁর বহু গ্রন্থেই লভ্য। ছোটদের জন্যে একটি নাটকও লিখেছিলেন ‘পণ্ডিত বিদায়’ নামে।

বড়োদের জন্যেও লিখেছেন। তুলনায় কম। বিভিন্ন সময় ভারতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিজলী, উত্তরা, আত্মশক্তি, নবশক্তি, বসুমতী, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা। আপনি কি হারাইতেছেন, আপনি জানেন না, ঘরণীর বিকল্প, প্রমিলার বিয়ে, প্রেমের কথামালা, প্রেমের প্রথম ভাগ, প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ, প্রেমের পথ ঘোরানো, প্রেমের বিচিত্র গতি, ফুটলো বিয়ের ফুল, বিচিত্র রূপিণী, বিবাহের পূর্বপাঠ, বিয়ে প্রুফ বৌ, ভালোবাসার অনেক নাম, ভালোবাসার অ আ ক খ, ভালোবাসার ইতিকথা, ভালোবাসার হাতে খড়ি, মনের মত বৌ, মেয়ে ধরা ফাঁদ, মেয়েরা হারাবেই, স্ত্রী মানেই ইস্ত্রী, স্বামী মানেই আসামী ইত্যাদি সংকলন ধৃত গল্পগুলি আজও উপভোগ্য। লিখেছেন অসাধারণ এক আত্মজীবনীঃ ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা। কয়েক দশকের বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির পরিচয় যেমন এতে পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় বিভিন্ন সাহিত্য ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ পরিচয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তাল সময়টিকে তিনি এ গ্রন্থে ধরে রেখেছেন। তাঁর বন্ধুগণ ঈর্ষণীয়। শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার, বুদ্ধদেব, নজরুল প্রমুখের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব। শিবরাম ছিলেন অজাতশত্রু।

শরৎচন্দ্রের ‘দেনাপাওনা’ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ‘ষোড়শী’ নামে। নিরুপমা দেবীর ‘দিদি’ উপন্যাসের নাট্যরূপও দিয়েছিলেন। মৌলিক নাটক লিখে সাড়া ফেলেছিলেন ‘যখন তারা কথা বলবে’ এবং ‘চাকার নীচে’ বিষয়বস্তুতে, চরিত্র নির্বাচনে, সংলাপ প্রয়োগে অভিনবত্বের স্পর্শ। শিবরাম বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। রীতিমত দুঃসাহসী তিনি। তাঁর রচিত কয়েকটি একাঙ্কিকা হলো- দেবা ন জানন্তি, রোমান্স, এক স্বর্ণ ঘটিত অপকীর্তি, থানা পুলিশ, উদ্বাস্তবিক।

‘মস্কো বনাম পন্ডিচেরি’র শিবরাম আমাদের বিস্মিত করেন। এ প্রবন্ধ সংকলনের প্রবন্ধগুলিতে এক চিন্তাশীল লেখকের দেখা পাই। যিনি ধর্ম, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা আর মার্ক্সীয় কমিউনিজম নিয়ে আলোচনা করেন। ‘আজ এবং আগামীকাল’ নামেও তাঁর আর একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত। এসমস্ত প্রবন্ধে যুগপৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের যোগ ঘটে। ঘটে তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতন স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী এক শিবরামের আবির্ভাব। যিনি যুক্তিশীল, সমাজবাদী, বিজ্ঞানবাদী এবং মানবতাবাদী। প্রগতিশীলও। ভুলে গেলে চলবে না, ছোটবেলায় স্কুল পড়ুয়া শিবরাম কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে জমিদারের বিরুদ্ধে খাজনা বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন। নীচুতলার মানুষজনের প্রতি টান ছিল আন্তরিক। মানসিকতায় ছিলেন বামপন্থী।

সত্যি কথা বলতে কী কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, হাসির গল্পাকার। শিবরাম আড়ালে চলে গেছেন। বাংলা সাহিত্যে শিবরামের জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা হাসির গল্পের জন্যই। তাঁর হাসির গল্পে ফান আর উইটেরই প্রাধান্য। নানা ধরণের অসঙ্গতি নিয়েই তাঁর গল্পের গড়ে ওঠা। আর উইটের পরিচয় রয়েছে গল্পের নামকরণে কিংবা তীক্ষ্ণ সরস মন্তব্যে। অধিকাংশ গল্পই pun দিয়ে লাগানো। তাই কী স্বচ্ছন্দেই না তিনি লিখতে পারেনঃ ‘গরুর জন্য যেমন শস্য গুরুর জন্য তেমনি শিষ্য। হংসডিম্ব আর পরম হংসরা অনায়াসে স্বয়ং সিদ্ধ হয়ে থাকেন। ‘টাকার জন্য টেঁকা আর টেঁকার জন্য টাকা’। স্মরণযোগ্য অসাধারণ বেশ কিছু গল্প তিনি লিখেছেন। ‘দেবতার জন্ম’ ‘আমার সম্পাদক’ ‘শিকার’ ‘কালান্তক’ ‘লালফিতা’ ‘স্বামী মানেই আসামী’ এসব গল্পের মার নেই। ‘দেবতার জন্ম’ এর শুরুটা কৌতুকমূখ্য, কিন্তু শেষ হয় মৃদু ব্যঙ্গে। ‘আমার সম্পাদক’ ‘ শিকার’ এ উত্তম পুরুষের জবানীতে কৃষি পত্রিকা চালানোর যে অভিজ্ঞতা পেশ করেন তা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। মাটির সঙ্গে যোগ নেই এমন এক শহরে বুদ্ধিজীবী তাই মুলো সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে জানান- “মুলো জিনিসটা পাড়বার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কখনই টেনে ছেঁড়া উচিৎ নয়; ওতে মুলোর ক্ষতি হয়। তার চেয়ে বরং একটা ছেলেকে গাছের ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে ডালপালা নাড়তে দিলে ভালো হয়। ... ঝাঁকি পেলেই টপাটপ মুলো বৃষ্টি হবে, তখন কুড়িয়ে ঝাঁকা ভরো।” এ গল্পে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন, কিন্তু ‘ কালান্তক’ ‘লালফিতা’য় সোচ্চার। সরকারি লালফিতার এমনই সাহায্য যে অর্ডার সাপ্লাইয়ের দক্ষিনা সহজে মিলে না। নানানতর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে তিনটি দিক অতিবাহিত হয়। বিভিন্ন দপ্তরে ফাইল চালাচালি হয়। বিল পাশের জন্য দরকার একুইশটি সইয়ের। উনিশটি সই জোগাড় করতেই তিন শতাব্দী কেটে যায়। বাকি থাকে মাত্র দুটি সই। অর্ডার যে সাপ্লাই করেছিল তার উত্তর পুরুষেরা প্রজন্ম পরম্পরায় সরকারী দপ্তরে তদ্বির করে। আমলারা আশ্বাস দেয়- এ হচ্ছে সরকারি কাজ- দরকারী কাজ। ... শ্লোলি বাট সিওরলি। এর বাধা বস্তুর চাল আছে, সবই রুটিন মাফিক...। নির্ভেজাল ব্যঙ্গ। ওয়ার্ক কালচারের সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। ‘স্বামী মানেই আসামী’ গল্পটি কৌতুকদীপ্ত। সব স্ত্রীর কাছেই স্বামী অপদার্থ, অযোগ্য। স্বামীকে তাই স্ত্রীর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। বীরেনবাবু আর নিবারণবাবুর নিজের নিজের স্ত্রীর কাছে তাই লাঞ্ছিত হন। স্বামী সমাজের অসহায়তাটুকু এ গল্পে প্রদর্শিত হয়। ‘ইঁদুর ধরা কল’ ‘পরকীয়া’ ‘স্ত্রী মানেই ইস্ত্রী’ ইত্যাদি প্রেমের গল্পও কৌতুকরসের। সামান্য কিছু গল্পে তিনি ব্যঙ্গপ্রবণ হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মূলত তিনি কৌতুকপ্রবণ। নির্দোষ আনন্দ দানই তাঁর লক্ষ্য। কারোও মনে আঘাত দেওয়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।

‘শিশু শিক্ষার পরিণাম’ ‘শিক্ষা দেওয়া সহজ নয়’ এসব ছোটদের জন্যই লেখা। কিন্তু শিশু মনস্তত্ব সম্পর্কে তিনি যে কতখানি ওয়াকিবহাল তা বেশ বোঝা যায়। শিশুদের যাঁরা শিক্ষা দেন, তাঁরা এ দুটি গল্প থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছুই পাবেন। শিশু মনের রহস্যভেদে শিবরাম নিঃসন্দেহে সফল ও সার্থক।

উইট সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র অল্পবিস্তর কিংবা ‘দৈনিক বসুমতী’র ‘বাঁকা চোখে’ কলামের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

বাংলা সাহিত্যে শিবরামের কোনও উত্তরসূরী নেই। আসলে শিবরামের কোন বিকল্প হয় না।

বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা : একটি পর্যালোচনা

ড. ব্রততী চক্রবর্তী

**অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ**

**কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়**

ছে**লেবেলায় একটি কৌতূহলোদ্দীপক রচনা শুনেছিলাম। রচনাটি একটি** চিঠি। **গ্রামের খবরাখবর দিয়ে স্বল্পশিক্ষিতা স্ত্রী চিঠি লিখছেন প্রবাসী স্বামীকে –**

**গ্রামের কৃষকেরা খেজুর গাছ। কাটিতেছে আমাদের গরুগুলি। দিনে দুইবার করিয়া দুধ দিতেছে বাবা। দাড়ি কাটিতে গিয়া গাল কাটিয়া ফেলিয়াছেন বিন্দুপিসি। জ্বরে ভুগিতেছেন ছাগল দুটি। কচি কচি ঘাস খাইয়া বমি করিয়াছে পুরোহিত ঠাকুরের মুখে। সবই শুনিবে। এই কি ছিল আমার কপালে তোমার পা? ফুলিয়াছে তোমার শরীর কেমন।**

**মনের ভাব নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় অকপটে প্রকাশ করা হলেও ছেদচিহ্নের অপপ্রয়োগে কি ভয়ংকর অর্থের প্রমাদ ঘটতে পারে, তারই কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ এটি। বলাবাহুল্য ছেদচিহ্নগুলি যদি যথাস্থানে বসান হয়, তাহলে অর্থের আর কোনো বিভ্রান্তি থাকে না। সম্ভবত সার্ধশতবর্ষ পূর্বে শিশুদের জন্য লেখা হয়েছিল এই রচনাটি। উদ্দেশ্য হাস্যরস-সৃষ্টি। তবে সেই সঙ্গে একটি শিক্ষার ব্যাপারও সেখানে কাজ করেছিল– ছেদচিহ্ন যথাস্থানে প্রয়োগ করার শিক্ষা ।**

**উদাহরণটিতে গ্রামের বধূ (স্বামীকে পত্র লিখতে গিয়ে) ছেদচিহ্নের অবস্থান বিষয়ে যে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, বস্তুত সেই অজ্ঞতা না থাকলেও, প্রারম্ভিক যুগের বাংলা গদ্যে ছেদচিহ্নের প্রয়োগ নিয়ে, সুশিক্ষিত নাগরিক গদ্যলেখকদের মনেও জিজ্ঞাসা বা দ্বিধা-সংশয় ছিল। তার কারণ নবগঠিত বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের স্বরূপ কী হবে, তার প্রয়োগ কেমন হবে, তা বাংলা সাহিত্যে পূর্ব-নির্ধারিত ছিলনা । গদ্যভাষার জন্মের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত দ্রুততর হল। বাংলা গদ্যভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, বাংলা গদ্যে ব্যবহৃত যতিচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটি পর্যালোচনা করাও প্রয়োজন। সে ইতিহাস যথেষ্ট কৌতূহল জাগায়।**

**গদ্যভাষার জন্মের পূর্বে বাঙালি পরিচিত ছিল বাংলা-পদ্যসাহিত্যের সঙ্গে। সেখানে চরণের শেষে একটি দাঁড়ি (।) বা দুটি দাঁড়ি (।।)-র ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল। পাঠ করতে অসুবিধার কারণ ঘটেনি। কিন্তু এই চিরপরিচিত যতিচিহ্নে অভ্যস্ত বাঙালি লেখকেরা গদ্যভাষার ছোট, বড় বা মাঝারি বাক্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে, উপযুক্ত যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা ও তার অভাব উপলব্ধি করলেন। ক্রমেই গদ্যভাষার বিভিন্ন লেখকেরা তাঁদের নিজস্ব বোধবুদ্ধি মত যতিচিহ্ন নিয়ে ক্রমেই পরিপূর্ণতা লাভ করল। বাংলা গদ্যের বিকাশ যেমন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পথটি প্রশস্ত করেছে, তেমনি বাংলা গদ্যে যতিচিহ্ন ব্যবহারের ঐতিহাসিক পদক্ষেপগুলি গদ্যভাষাকে ক্রমেই অর্থবহ, সাবলীল ও সার্থক করে তুলেছে। আর সবাই জানেন, যতিচিহ্নের অপপ্রয়োগে ভাষার দুর্দশা কত মারাত্মক হতে পারে। ছেলেবেলায় শোনা ভুল ছেদচিহ্ন-সম্বলিত চিঠিটির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ।**

**বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা স্পট হয়ে যায় যে, বাংলায় যতচিহ্নের প্রবর্তনা কোনো একক প্রতিভার দ্বারা সংঘটিত হয়নি, তার পশ্চাতে ছিল বহু মানুষের প্রয়াস এবং ১৮০১ থেকে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের যথোপযুক্ত প্রয়োগ প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।**

**ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গদ্যভাষার যে সামান্য নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যায়, ইংরেজ প্রভাবের আগেই বাংলা গদ্যভাষা ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে লেখা কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের একটি চিঠি; অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পুত্র গুরুদাসকে লেখা বিপন্ন মহারাজ নন্দকুমারের চিঠি; কিংবা সহজিয়া বৈষ্ণব-সাধকদের পুথিতে প্রান্ত সাধনভজন সংক্রান্ত গদ্যভাষার নিদর্শনগুলি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যতিচিহ্ন বলতে, এ-সময়ের রচনায়, শুধুমাত্র বাক্যের শেষে ছেদচিহ্ন প্রয়োগ করা হয়েছে ।**

**প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ লেখা হয় রোমান হরফে, মানোয়েল-দা-আস্‌সুম্পসাওঁ-এর ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ নামে। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবান শহরে মুদ্রিত হয় বইটি। রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে এ-জাতীয় কিছু গ্রন্থ লিখেছিলেন। এসকল গ্রন্থের মাধ্যমে বিদেশি যতিচিহ্নগুলি কালক্রমে বাংলা গদ্যসাহিত্যে স্থান করে নেয়। মানোয়েলের বইয়ে কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপ ইত্যাদি বিদেশি যতিচিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। একটি উধাহরণ –**

Sevilha xuhore eq Grihoxto assilo, tahar nam Cirilo, xei Cirilo quebol eq putro jormilo; tahare eto doea corilo, ze cono din tahare xiqhao na dilo ebang xaxtio na dilo; xe zaha corite chahito, taha corito.

এর বাংলা লিপ্যন্তর –

শেভিলা শুহরে এক গৃহস্থ আছিল, তার নাম সিরিলো, সেই সিরিলো কেবল এক পুত্রো জর্মাইল; তাহারে এতো দয়া করিল, যে কোনো দিন তাহারে শিক্ষাও না দিল এবং শাস্তিও না দিল; সে যাহা করিতে চাহিত, তাহা করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা পুথির অক্ষর থেকে বাংলা ছাপার হরফ তৈরী করা হল এবং পুথিতে ব্যবহৃত যতিচিহ্নগুলিকে গ্রহণ করা হল যেমন, এক দাঁড়ি (।), দুই দাঁড়ি (।।), কসি (-), দাঁড়ির মাঝে কসি (।-।, ।।-।।) বা বিন্দু (।.।, ।।.।।) । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুদ্রিত আইন-সংক্রান্ত দু–একটি বাংলা গ্রন্থে শুধুমাত্র এই যতিচিহ্নগুলিই আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কিংবা কলকাতার অন্যান্য প্রেস থেকে মুদ্রিত গ্রন্থেও কেবল দাঁড়ি (।) ও কসি (-) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম বাংলা মৌলিক গদ্যগ্রন্থ রামরাম বসুর ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ (১৮০১)–তেও দাঁড়ি ও কসি ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা পুথি থেকে তৈরী করা এ সকল যতিচিহ্ন দীর্ঘকাল বাংলা বইয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইস্ট Oriental Fabulist (১৮০৩) নামে ঈশপের গল্পের অনুবাদ করিয়েছিলেন অনেকগুলি ভাষায় – সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা ও বাংলায়। সব ভাষার রচনাগুলিই রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। বাংলা অনুবাদটি করেছিলেন তারিণীচরণ মিত্র। এই রোমান হরফের বাংলা গ্রন্থে ইংরেজি যতিচিহ্নের প্রয়োগ হয়েছে। রোমান হরফে লেখা বাংলা বাইবেলের অনুবাদেও ইংরেজি যতিচিহ্ন এসেছে এবং বাক্য শেষে সর্বদা ফুলস্টপ্ বা বিন্দু(.) প্রয়োগ করা হয়েছে। কলকাতার মিশনারিরা দীর্ঘকাল ফুলস্টপ (.) এর পক্ষপাতী ছিলেন, বাংলা বইয়ে দাঁড়ি ছেদচিহ্নটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও।

কলকাতার স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭)–ই প্রথম বাংলা গ্রন্থে ইংরেজি যতিচিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন। নীতিকথা (১৮১৮) ও অন্যান্য বাংলা পাঠ্যপুস্তকে প্রথম দিকে দাঁড়ির স্থানে ফুলস্টপ ব্যবহৃত হয়, পরে দাঁড়ি প্রতিষ্ঠা পায়। এখান থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা ‘দিগ্দর্শন’ (১৮১৮)–এর প্রথম সংস্করণে বিরাম চিহ্নরূপে এসেছিল বাংলার সাবেকি দাঁড়ি ও কসি। কিন্তু পরের বছর থেকেই কমা, সেমিকোলন ইত্যাদিও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। স্কুল বুক সোসাইটিই প্রথম দেশী ও বিদেশী যতিচিহ্নের সম্মিলন ঘটান তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ বা পত্রিকায়।

তবে বাঙালি রচিত যতিচিহ্নহীন বা শুধুমাত্র দাঁড়ি প্রযুক্ত গদ্যরচনাও দীর্ঘকাল প্রচলনে ছিল। লিখিত গদ্যভাষায় বাক্যের গঠন, পদের বিশিষ্ট বিন্যাস, সুরের ওঠানামা, উচ্চারণ ইতাদিতে বাঙালি যত অভ্যস্ত হয়েছে, যতিচিহ্নের ব্যবহার ততই ব্যাপক ও সার্থক হয়েছে।

রামরাম বসু ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ (১৮০১)-তে, দাঁড়ি ও কসি, এই দুটি বিরামচিহ্ন গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম দাঁড়িকে ব্র্যাকেট চিহ্নরূপে ব্যবহার করেন। আবার দাঁড়িকে উদ্ধৃতি চিহ্নরূপে ব্যবহার করেছেন মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার তাঁর ‘বেদান্তচন্দ্রিকা’ (১৮১৭)-য়। রামমোহন রায়ের রচনাতে এক দাঁড়ি (।) বা দুই দাঁড়ি (।।) গৃহীত হয়েছিল। দুই দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন তিনি এক একটি প্রসঙ্গ বা অনুচ্ছেদের শেষে। দাঁড়িকে কোথাও কোথাও তিনি ব্র্যাকেট চিহ্নরূপেও ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি যতিচিহ্নের মধ্যে রামমোহন একমাত্র উদ্ধৃতি চিহ্ন গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের ‘ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার’ (১৮১৮, মে) থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে –

‘ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে “ঘৃতাভোজির কাছে ঘৃত কি মিথ্যা’’ উত্তর ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং মর্দ্দন ও ক্রয়বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃততে নাই এনিমিত্ত সে ঘৃতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে।’

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৩৯)–র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম নিয়মিতভাবে ও সুষ্ঠুভাবে বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার করেন। তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর প্রথম সংখ্যাতেই দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, উদ্ধৃতিচিহ্ন, জিজ্ঞাসাচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদের ক্ষেত্রে বাক্যের শেষে দুই দাঁড়ির (।।) ব্যবহারও করেছেন তিনি যেমন,

‘জীবাত্মাকে রথিরূপে, শরীরকে রথীরূপে এবং বুদ্ধিকে সারথিরূপে, আর মনকে প্রগ্রহরূপে জান ।।’ (১৮৪৬, বৈশাখ) । আর জিজ্ঞাসাচিহ্ন ব্যবহারের একটি উধাহরণ–

‘....তাহাদের এ দুঃখ প্রতীকারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা কাহাকে এ মর্মবেদনা জ্ঞাত করিবেক? কাহার নিকটেই বা ক্রন্দন করিবেক? কে বা তাহাদের দীনদশা ও অশ্রুপূর্ণ নেত্র দেখিয়া দয়া প্রকাশ করিবেক ?’ (১৮৫০, কার্তিক)।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিস্ময়বোধক চিহ্নও ব্যবহৃত হয়েছে। পুরণো বাংলার যতিচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি যতিচিহ্নের ব্যবহার এই পত্রিকায় এমন ব্যাপকভাবে ও সার্থকভাবে হতে থাকে যে, বাংলা গদ্যভাষার সঙ্গে সে সকল যতিচিহ্নের আত্মীকরণ ঘটতে থাকে, তাঁদের আর বহিরাগত বলে মনে হয় না। অক্ষয়কুমার দত্ত পাদটীকার সংকেতগুলিকেও প্রথম বাংলা গদ্যে প্রয়োগ করেন। যেমন, \* ++ sS ইত্যাদি সংকেতগুলি প্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেখা যায় ।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিদ্যাকল্পদ্রুম’ (১৮৪৬)ও Encyclapodia Bengalensis (১৮৪৬) গ্রন্থে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, ড্যাস, জিজ্ঞাসাচিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন সবই ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষ্ণমোহন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলার পাঠ্য গ্রন্থগুলির নির্বাচন ও সম্পাদন করেছেন। নির্বাচিত শ্রীরামপুর মিশনের গ্রন্থগুলির যতিচিহ্নের সংস্কারও তিনি করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থে রোমান যতিচিহ্নের ব্যবহার তাঁর দ্বারা এইভাবে স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল ।

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে Rev. W.Yates –এর Introduction to the Bengali Language (1 – 11 Vols) গ্রন্থে চণ্ডীচরণ মুন্সীর ‘তোতাইতিহাস’, রামরাম বসুর ‘লিপিমালা’, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ‘বত্রিশ সিংহাসন’ প্রমুখ গ্রন্থ থেকে সংকলন করে বাংলা ভাষার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সেখানে ব্যাপকভাবেই যতিচিহ্নের প্রয়োগ ঘটেছে। একটি উদাহরণ ‘বত্রিশ সিংহাসন’ থেকে –

‘প্রথম পুত্তলিকা কহিলেন, শুন, হে রাজা ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব ও দান ও প্রতাপ তোমাকে কহিলাম; যদি তোমার এ সকল থাকে, তবে এ সিংহাসন বসিবার উপযুক্ত হও ।’

বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। বেতালপঞ্চবিংশতির ১ম ও ২য় সংস্করণে দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। পরবরতী সংস্করণগুলিতে দাঁড়ির সঙ্গে প্রচুর কমা ও সেমিকোলনের ব্যবহার আছে। অবশ্য তাঁর ‘জীবনচরিত’ (১৮৪৯) গ্রন্থে প্রথমাবধিই যতিচিহ্নের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পূর্ববর্তী বা সমকালে গদ্যসাহিত্যে ব্যবহৃত যতিচিহ্নকে আরও বিজ্ঞান-সম্মতরূপে প্রয়োগ করা যায় কি না, সে ভাবনা তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। এ-ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেছেন– ‘অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম নিয়মিতভাবে ছেদচিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছেদচিহ্নের ব্যবহার দীর্ঘ বাক্যের Syntax-এর সঙ্গে সমতাল করে দিয়েছিলেন। সে আদর্শ সাক্ষাৎ শিক্ষার্থীদের জন্য পরোক্ষ সাধারণ লেখকদের জন্য, মুখ্যত বিদ্যাসাগর এবং গৌণত অক্ষয়কুমার দত্ত ধরে দিয়েছিলেন।’

বিদ্যাসাগর মূল ক্রিয়া বা কর্তারসঙ্গে পদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন পদের ব্যাকরণসম্মত বিন্যাস করে। ছোটোদের জন্য লেখা পাঠ্যগ্রন্থগুলিতে এ- কারণেই তিনি প্রচুর কম, সেমিকোলন ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগরের বাংলাভাষাকে কত দিক থেকে কতভাবে উন্নত করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে যাবার অবকাশ এখানে নেই, আমরা শুধু তাঁর যতিচিহ্ন ব্যবহারের দুএকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে স্পষ্ট করতে পারি, এ ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতা কতটা –

‘বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি ।’(শকুন্তলা) অথবা –

‘দুর্ভাগ্যক্রমে, পুরুষজাতির অনবধান দোষে, স্ত্রীজাতি নিতান্ত অপদস্থ হইয়া রহিয়াছে । ভারতবর্ষের ইদানীন্তন স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় ।’ (বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয়)।

বিদ্যাসাগর নিজের গ্রন্থের বিবিধ সংস্করণে যতিচিহ্নে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। বিশেষত কমা ও সেমিকোলনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে। গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই যতিচিহ্ন দুতির আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে বিদ্যাসাগর পদের অন্বয় ও যতিবন্ধনের যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেই পথ অনুসরণ করে বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের স্বাভাবিক প্রয়োগ হয়ে চলেছে দীর্ঘকাল ধরে ।

তথ্যসূত্র –

১) সুকুমার সেন, ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ন, বিশ্বভারতী পত্রিকা (মাঘ-চৈত্র,

১৩৭০)

২) শিশিরকুমার দাশ, বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১-১৮৫০, বিশ্বভারতী পত্রিকা

(কার্তিক-পৌষ, ১৩৭০)

৩) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (দ্বাদশ সংস্করণ,

১৯৯৯-২০০০)

বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধদুতি সংগ্রহ করেদিয়েছেন প্রো. উজ্জ্বল

কুমার মজুমদার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই ।

শিশু ও কিশোরসাহিত্য সুনির্মল বসু

ড. সনৎকুমার নস্কর

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা শিশু ও কিশোরসাহিত্য জগতে সুনির্মল বসু একজন অতিপরিচিত লেখক-ব্যক্তিত্ত্ব। ছোটদের জন্য ছড়া, গল্প, নাটক, জীবনী, রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস এমন আরো কত কী-না তিনি লিখে গেছেন তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবনে। সাকুল্যে প্রায় সত্তরটার মতো বই বেরিয়েছে তাঁর হাত থেকে এবং প্রায় প্রত্যেকটিতেই তিনি অবিশ্বাস্য দক্ষতায় কেড়ে নিয়েছেন শিশু ও কিশোরদের মন। কেবল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রান্তসীমা থেকে পাঁচের দশকের মধ্যপর্ব পর্যন্ত, তাঁর রকমারী লেখায় পরিচর্য পেয়েছে ষাট-সত্তর আশির দশকের বাঙালি কিশোরের কল্পনাবৃত্তি ও রসবোধ। প্রশ্ন জাগে, সুনির্মলের লেখায় বিষয়বস্তুতে কিংবা বলবার কৌশলে কী ছিল সেই জাদু, যার কারণে তাঁর রচনা এত মনোগ্রাহী হয়েছে অল্পবয়সীদের কাছে? তাঁর সৃষ্টিসম্ভার বা শিশু কিশোরসাহিত্যকে কতটাই বা সমৃদ্ধি করে গেল, সেটারও যৎকিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করতে টুকরো এই নিবন্ধের অবতারণা।

সুনির্মল বসুর জন্ম বিহারের গিরিডিতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ (ইং ২০ জুলাই ১৯০২)। তাঁর পিতার নাম পশুপতি বসু। এঁরা আদতে ছিলেন ঢাকার লোক। মালখানগরের বাসিন্দা। সুনির্মলের পিতা বৃত্তিতে প্রথম জীবনে ছিলেন শিক্ষক। কর্মসূত্রে থাকতেন গিরিডিতে, আর সেখানেই সুনির্মল ভূমিষ্ট হন। পশুপতিবাবু সাহিত্যনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। পুত্রের জন্য নতুন নতুন গল্প ও কবিতার বই কিনে আনতেন। পিতার এই সস্নেহ আচরণ সুনির্মলকে প্রথমাবধি সাহিত্য রচনার উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। পিতা ছাড়া তাঁর জীবনে আর-এক ব্যক্তির প্রভাব ছিল প্রকট। তিনি হলেন সুনির্মলের মাতামহ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। ইনি ছিলেন বরিশালের সেকালের বিখ্যাত জননেতা। অগ্নিযুগের বাংলায় ইনি ‘নবশক্তি’ নামে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা পরিচালনা করতেন। বড়দের পাশাপাশি লিখতেন ছোটদের জন্যেও। মোহনভোগ, পদ্যমালা, হিতোপদেশ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার রচনা, যা সুনির্মলের শিশুমনকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিল। এ ধরণের ব্যক্তি-প্রভাবের বাইরে সুনির্মলের সৃজনশীল সত্তাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল খুব ছোটবেলায় পাওয়া সাঁওতাল পরগনার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনে সৃষ্টি ব্যাকুলতা প্রথম ধরা দিতে থাকে কবিতার আকারে। এ ধরণের একটি কবিতা সর্বাদৌ মুদ্রিত হয় ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়। অচিরেই তিনি খুঁজে পান নিজের ভালোলাগার ক্ষেত্রটিকে। সুনির্মল বুঝতে পারেন শিশু ও কিশোরসাহিত্য তিনি যতটা স্বচ্ছন্দ অন্যত্র ততটা নন। তাঁর ভিতরকার শিশু-সাহিত্যিকের এই সুপ্ত প্রতিভা উন্মোচনে সেকালের দুটি শিশু ও কিশোর মাসিক পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এদের একটি হল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ও সুকুমার রায় সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ ও অন্যটি সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘মৌচাক’ পত্রিকা। এখানে উল্লেখ্য যে, সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সুনির্মল চিত্রাঙ্কন বিদ্যাতেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ দুটি পত্রিকায় কখনো কখনো তাঁর লেখা চমৎকার রেখার বিন্যাসে সুসজ্জিত হয়েও প্রকাশ পেতো। এই বিদ্যায় তিনি কিশোর বয়সেই যথেষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। যাইহোক সাহিত্য রচনা ও ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল সাধারণ বিদ্যা শিক্ষার কাজও। তাই দেখা যায়, ১৯২০ সালে সুনির্মল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বেরোচ্ছেন। এরপর ভর্তি হলেন কলকাতার সেন্ট পল্‌স্‌ কলেজে। এই সময়টায় দেশ জুড়ে তখন প্রবাহিত হচ্ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতির উত্তাল হাওয়া। ১৯২১-এ গান্ধীজি ডাক দিয়েছিলেন দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের। সুনির্মলও আর চুপচাপ থাকতে পারলেন না। কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। পরে অবশ্য তিনি ভর্তি হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজে। ততদিনে তিনি শিশু ও কিশোরদের উপযোগী ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রূপকথা, কৌতুকনাট্য ইত্যাদি রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। সুনির্মল বসুর প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই ‘হাওয়ার দোলা’। ক্রমশ তাঁর কুশলী হাত থেকে বেরোবে ছানাবড়া, বেড়ে মজা, হৈ চৈ, হুলুস্থুল, পাততাড়ি, কবিতা মঞ্জরী, ছন্দ ঝুমঝুমি প্রভৃতি কবিতার বই। অ্যাডভেঞ্জার হিসেবে লিখেছিলেন রোমাঞ্জের দেশে, জীবন্ত কঙ্কাল, জ্বলন্ত অদৃষ্ট, পাহাড়ে-জঙ্গলে ইত্যাদি গ্রন্থ। কিশোরদের উপযোগী করে কয়েকজন বাঙালি মনীষীর জীবনীও লিখেছিলেন তিনি, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন রাজা রামমোহন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন। কৌতুক-আশ্রয়ী গল্প রচনায় সুনির্মলের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। অসংখ্য গল্পের স্রষ্টা তিনি। রূপকথা, উপকথা, পশু বা প্রাণীকথা, পরীর গল্প, ডানপিটদের দুঃসাহসিক কাহিনি কিংবা নিরীহ গোবেচারাদের নিয়ে মজার মজার টুকরো লেখা লিখেছেন অজস্র। কিপ্টে ঠাকুরদা, সব ভূতুড়ে, নিঝুম পুরীর স্বপ্নকথা, রঙিন দেশের রূপকথা, মরণের ডাক, মরণ ফাঁদ, শহুরে মামা। বীর শিকারী ইত্যাদি বেশ কয়েকটি গল্পগ্রন্থের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর হাত দিয়ে। ছন্দ সম্পর্কে ছোটদের আগ্রহী করে তোলার ব্যাপারেও তাঁর ইচ্ছা ছিল যথেষ্ট। সেদিক তাকিয়ে লেখেন ‘ছন্দের টুংটাং’, ‘ছন্দের গোপন কথা’ ইত্যাদি ছোটদের কবিতা শেখার মতো বই। এসব তাত্ত্বিক বইয়ে সরল ভাষায় প্রচুর উদাহরণ সহযোগে ছন্দের মতো জটিল বিষয়কে তিনি ছোটদের উপযোগী করে পরিবেশন করতে পেরেছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল নির্মল কৌতুক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশুদের বিশুদ্ধ আনন্দদান। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গল্পচ্ছলে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে অল্পবয়সীদের চরিত্রগঠনের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। জীবনের শেষদিকে লিখতে শুরু করেন আত্মজীবনী – ‘জীবনখাতার কয়েক পাতা’। এর প্রথম খণ্ডটি মাত্র প্রকাশিত। আর সম্পাদক হিসেবে কেবল পত্রিকা সম্পাদনাই করেননি, দুটি গ্রন্থও সম্পাদনা করেছিলেন কিশোর পড়ুয়াদের দিকে তাকিয়ে- ‘ছোটদের চয়নিকা’ ও ‘ছোটদের গল্পসঞ্চয়ন’।

সুনির্মল বসুর কিশোর-ভোগ্য কিছু রচনার পর্যালোচনা করতে গিয়ে, তাঁর সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ এই ধারণাটুকুকে সামনে রাখতে হল এই কারণে যে, একজন সাহিত্যিকের সৃষ্টি কর্মের ব্যপ্তি ও রচনাগত প্রকৃতিকে কিছুটা জানতে পারলে তাঁর সম্বন্ধে বিচার অনেকটা সহজ হয়ে আসে। একইসঙ্গে, ঐ বিশেষ সাহিত্যধারার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে রচয়িতার রচনারাশির পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর দানের পরিমাণটাও বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হয়। বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যের পুরনো ইতিবৃত্তের খবর রাখেন যাঁরা তাঁরা জানেন এ ধারার সৃষ্টি সেই উনিশ শতকে। প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র হিসেবে চিহ্নিত ‘দিকদর্শন’ – এর পাতায় শিক্ষনীয় অনেক কিছু পরিবেশিত হত অল্পবয়সীদের জন্যে। এর পরের ধাপে স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে বের হতে থাকে ‘পশ্বাবলী’ পত্রিকা, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে ছাত্রদের কাছে কিছু জ্ঞানোপযোগী তথ্য পরিবেশন করা। বলাবাহুল্য যে, এই গুলোকে ঠিক বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্যের কোথাও ফেলা যায় না, যেমন যায় না উনিশ শতকের মধ্য পর্ব থেকে পড়ুয়া সমাজে আবির্ভূত বাংলা ‘প্রাইমার’ গুলোকে। কেননা এগুলির মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষা, অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান – যা কোন বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের উদ্দ্যেশের পরিধির মধ্যে থাকে না। এজন্য অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ কিংবা বিদ্যাসাগরের লেখা বোধদয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী ইত্যাদি বইগুলি নবীন পাঠার্থীদের পক্ষে উপাদেয় প্রাইমার হিসেবে গুরুত্ব পেলেও প্রকৃত শিশুসাহিত্যের ভিত তৈরিতে এদের আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে। কিশোর-সেব্য পত্রিকার নথিপত্র নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তাঁরা এটাও দেখেছেন যে, কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত ‘বালকবন্ধু’ কিংবা প্রমদাচরণ সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদিত ‘সখা’ পত্রিকার উদ্দিষ্ট পাঠক হিসেবে অল্প বয়সীরা বিবেচিত হলেও সেখানে গল্প কবিতার পাশাপাশি তাদের জ্ঞানের খোরাক জোগাতে কাগজের পাতে পরিবেশন করা হয়েছিল বিজ্ঞান, নীতিকথা, গণিত, ব্যকরণ, ইতিহাস, মায় স্বাস্থ্যবিধি। কিন্তু ১৮৮৫ তে যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদকত্বে ‘বালক’ বেরুলো তখন তাতে বিশুদ্ধ কিশোর পত্রিকার চরিত্র অনেকটাই ফুটে উঠল। এর দশ বছর বাদে নবীন পাঠক – পাঠিকাদের হাতে এল শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘মুকুল’। শিশু ও কিশোরদের জন্যে রবীন্দ্রনাথ ‘বালক’-এ আগেই কলম ধরেছিলেন। এবার তিনি তো রইলেনই সঙ্গে পাওয়া গেল জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে। ‘বালক’-এর দেখাদেখি ‘মুকুল’ আরও একটা পদক্ষেপ নিয়েছিল কচিকাঁচাদের লেখবার সুযোগ করে দিয়ে। নবীন বালক-বালিকারা, যারা সৃষ্টিশীল, সাহিত্য রচনায় যারা সবে হাতে- খড়ি দিচ্ছে, সেইসব অস্ফুট কোরকদের প্রস্ফুটিত করে তোলাও তো এ ধরনের পত্রিকার একটি অবশ্য করণীয় কাজ। মনে রাখা দরকার, এই ‘মুকুল’ এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল পরবর্তী সময়ের বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়। সুনির্মল বসুর ক্ষেত্রেও প্রায় একই রকম ঘটনার অনুবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। ১৯১৩-তে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বের করেছিলেন সেকালের কিশোর-কিশোরীদের কাছে সব চেয়ে লোভনীয় পত্রিকা ‘সন্দেশ’। অনেকের মতে এই অলঙ্কৃত ও সুমুদ্রিত সর্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা ঘটেছিল। আর এ পত্রিকারই হাত ধরে ছড়া ও গল্পকার সুর্নিমল বসু সকলের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ১৯১৫-তে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হলে এ পত্রিকার দায়িত্ব বর্তায় তার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় সুকুমার ও সুবিনয় রায়ের উপর। সন্দেশের ষষ্ঠবর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় ‘মুন্সিজী’ নামে একটি হাস্য রসাত্মক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল সুনির্মলের। সম্ভবত এটাই ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। পরবর্তী কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সংখ্যায় তাঁর কিছু কবিতাও ছাপা হয়েছিল। তবে কেবল শব্দ নির্ভর গল্প কিংবা কবিতা নয়, তার সঙ্গে থাকত নিজের আঁকা ইলাস্ট্রেশানও। পাঠকের মন কাড়তে সেগুলোরও কম ভূমিকা ছিল না। বস্তুত ‘সন্দেশ’- এর মাধ্যমেই সুনির্মল বসু বাংলা শিশুসাহিত্য পাঠক সমাজের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ‘মৌচাক’ পত্রিকা, যা শিশুসাহিত্যের জগতে নতুন যুগের সূচনা করেছিল। লক্ষণীয়, এ পত্রিকার অধিকাংশ লেখকই ছিলেন সাবালক-পাঠ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। ফলে তাঁদের হাতের গুণে শিশুসাহিত্যের গুণগত পরিবর্তন ঘটলো; তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ও সংকটকেও এনে হাজির করলেন শিশুদের আঙিনায়। সত্যের খাতিরেই বলতে হবে, ‘মৌচাক’- গোষ্ঠীর লেখকরা প্রধানত বাংলা কিশোরসাহিত্যের ধারাটির পত্তন ও বিকাশ ঘটালেন। এ সাহিত্যধারার মধ্যে বাংলা কিশোরসাহিত্যের ধারাটির পত্তন ও বিকাশ ঘটালেন। এ সাহিত্যধারার মধ্যে যেসব রচনা ক্লাসিক বলে গণ্য হয়, যেমন, চাঁদের পাহাড়, বুড়ো আংলা, পাথরের ফুল ইত্যাদি তার অনেকগুলিই মৌচাকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিলেন সুনির্মল বসু। ‘মৌচাক’-এর পর শিশু ও কিশোরসাহিত্যের জগতে একে একে পদার্পণ করে ‘শিশুসাথী’ (১৯২২), ‘রামধনু’ (১৯২৭), ‘মাসপয়লা’(১৯২৯), ‘রংমশাল’(১৯৩৭) প্রভৃতি পত্রিকা। এদেরকে আশ্রয় করে যে সব শিশু-সাহিত্যিকরা আবির্ভূত হন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন লীলা মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ লেখকেরা। সুনির্মলকেও কখনো কখনো এসব পত্রিকায় লিখতে দেখা গেছে। তবে লেখক হিসেবে তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন নানাভাবেই। উনিশ ও বিশ শতকের অনেক কিশোর- সাহিত্যের স্রষ্টাকে দেখা গেছে এমন লেখা লিখতে, যাতে অল্পবয়সীদের মনে ধর্মভীতি তথা ঈশ্বরবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যায়। সুনির্মল কিন্তু সে পথের পথিক নন। তিনি বরং বিশুদ্ধ মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে শিশু ও কিশোরদের মনকে পরিচর্যা দিতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন নির্ভেজাল আনন্দলাভের পাশাপাশি তাঁর কবিতা-গল্প-নাটকের ক্ষুদে পড়ুয়ারাও কিছুটা সামাজিক শিক্ষায় পোক্ত হোক। আসলে সুনির্মল বসু সবক্ষেত্রে সাহিত্যের বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক অভিপ্রায়ের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চাননি। অথচ এটাই ছিল তাঁর সমকালের শিশু-সাহিত্যের দস্তুর। সুনির্মলের কিছু গল্প পড়তে বসে সচেতন পাঠকের একটা কথা নির্ঘাৎ মনে হবেই যে, এই রচনাগুলো শিশুদের চরিত্রগঠন এবং তাদের সামাজিক দিক থেকে শিক্ষিত করে তোলার তাগিদ থেকেই লেখা হয়েছে। গল্পের প্লট, চরিত্র, বক্তব্য এমনই যে তাতে সহজ ভাষায় শিশু শিক্ষার আয়োজন বেশিমাত্রায় চোখে পড়ে। এর সেরা দৃষ্টান্ত সম্ভবত ‘ইন্টিবিন্টির আসর’। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন শিশুসাহিত্যিকের প্রধান ভূমিকা কী? তিনি কি নীতিশিক্ষা দেবেন, নাকি নির্মল আনন্দের নির্ভেজাল পরিবেশক হবেন? এ প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেওয়া অসম্ভব। অসম্ভব এই জন্য যে, শিশু-কিশোরের মন পরিণত বয়স্কদের মতো নয় যেমন, তেমনই ঐ মনই একতাল কাদামাটির মতো নরম ও নমনীয়- যাকে বিভিন্ন ছাঁচে ফেলে নানান গঠন দেওয়া যায়। শিশুশিক্ষা তাই বয়ঃপ্রাপ্তদের শিক্ষার তুলনায় কেবল প্রকৃতিতে ভিন্ন নয়, আয়োজনেও তা পৃথক অভিনিবেশ দাবি করে। সুনির্মল বসুর লেখায় নির্মল আনন্দের রসধারা প্রবাহিত হয়েছে তো বটেই, উপরি-পাওনা হিসেবে মেলে সেইটুকু শিক্ষা যা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের পক্ষে দরকারী। সৎ সাহিত্যিক মাত্রেই সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী। তাঁরা সারস্বত সাধনার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না সমাজের মঙ্গল সাধনাকে। শিশুমনের অভ্যন্তরস্থ কোমল বৃত্তিগুলির পূর্ণ প্রস্ফুটনে শিশুর চারপাশের ভৌম পরিবেশ যেমন ভূমিকা নেয়, তার মনোলোকে সমান জায়গা করে নেয় তার আস্বাদিত সাহিত্যের ভাব ও কল্পনা। গল্পকার সুনির্মল দৃষ্টান্তধর্মী টুকরো টুকরো কাহিনিতে তাঁর খুদে পাঠকদের মনের জমিতে কিছু মঙ্গলময় ভাবনার বীজকে পুঁতে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি হয়ত বিশ্বাস করতেন লেখকদের সমাজ- শিক্ষক হওয়ার ভূমিকায়। বিশেষ করে সেইসব পাঠকদের শিক্ষক, যাদের মন তখনও পর্যন্ত সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতে সেভাবে পাকেনি, কিংবা বিকৃত হয়ে যায়নি।

আলোচনার এই প্রেক্ষাপটে রেখে ‘ইন্টিবিন্টির আসর’ এবং বেশ কয়েকটি ‘ফেবল’- ধর্মে গল্পের বিষয়বস্তুর ও উপস্থাপন রীতির গভীরে এবার একটু তাকানো যেতে পারে। প্রথমোক্ত রচনাটি আসলে কিছু গল্পের সমষ্টি, যেখানকার পাত্রপাত্রীরা মূলত অভিন্ন। ইংরেজি পরিভাষায় এরা ‘সিরিজ’ বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। বাংলাতে এ ধরনের লেখা আগেও আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন উপেন্দ্রকিশোরের ‘টুনটুনির বই’ কিংবা সুকামার রায়ের ‘পাগলা দাসু’। সুনির্মল বসুর অভিনবত্ব এইখানে যে, ইন্টিবিন্টির আসরের গল্পগুলকে তিনি অবিমিশ্র শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন। এই শিক্ষা শিশুকে করে তুলবে স্বদেশপ্রেমিক, সামাজিক, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন পথের পথিক। গল্প শুরুর আগে ছোট্ট একটু ভূমিকা করে নিয়েছেন লেখক, দিয়েছেন চরিত্রগুলির পরিচয়। ইন্টি, বিন্টি আর সিন্টি তিনটি ছোট্ট মেয়ে। তাদের সঙ্গে আছেন দীনু খুড়ো, পাগলা দাসু আর ভৃত্য রামহরি। এছাড়া একটা কুকুর ‘ভোলা’। এই পাত্রপাত্রীদের নিয়ে লেখা হয়েছে বেশ কয়েকটি গল্প- পর্যায়ক্রমে। গল্পগুলো ভালো করে লক্ষ করলে বিশেষ একটা প্যাটর্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। ইন্টি-বিন্টি-সিন্টিরা অবোধ, নরম মনের শিশু। তারা হাসিখুশিতে সর্বদা ডগমগ, আনন্দোচ্ছ্বল। পাগলা দাসু তাদের পড়শী। সে হ্যাংলা, হুতোম-পানা, বোধবুদ্ধি কম। তার অধিকাংশ কাজকর্মই হঠকারী অবিবেচকের মতো। আর দীনু খুড়ো নিয়মনিষ্ঠ, নীতিপরায়ণ, অভিজ্ঞ। ফলে পাগলা দাসুর ভুলভ্রান্তিগুলো তিনি ধরিয়ে দেন, তাকে নানাবিধ ব্যাপারে সাবধান করেন, ভুল করলে সংশোধন করিয়ে দেন। দীনু খুড়ো যেন সেই নীতি শিক্ষক যিনি লেখকের অন্তরে বিরাজ করেন। গল্পগুলো তাদের নিজস্বধারায় এগিয়ে চলে আর দীনু খুড়োর জবানী মারফৎ এ সিরিজের খুদে পড়ুয়ারা জানতে পারে, দেশ আর দেবতায় কোন ভেদ নেই, পার্থক্য নেই তাদের পূজা ও শ্রদ্ধায়। দেশের প্রতীক হল দেশের পতাকা, যার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো দেশবাসী মাত্রেরই কর্তব্য। কোন অবস্থাতেই দেশের পতাকাকে অসম্মানিত অথবা ধূল্যবলুন্ঠিত হতে দেওয়া উচিৎ নয়। স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে এই সিরিজেই গল্প আছে বেশ কয়েকটি। যেমন, বদহজম যাতে না হয় তার জন্য সব সময় খাবার জিনিস ভালো করে চিবিয়ে খাওয়া উচিৎ; কিংবা আমাদের শয়নকক্ষে যাতে বিশুদ্ধ বাতাস চলাফেরা করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার; অথবা এঁদো পুকুরের নোংরা জলে বিভিন্ন রোগের বীজ ঠাসা থাকে বলে সে জলে স্নান না করা উচিৎ ইত্যাদি। এই সিরিজের গল্পগুলিতে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সামাজিক ভাবেও শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন সুনির্মল। একটি গল্পে দেখিয়েছেন পাগলা দাসুর নির্বোধ রসিকতায় কিভাবে ইন্টি-বিন্টিরা বিপদে পড়েছিল।। তাই দীনু খুড়ো তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ‘যে ঠাট্টায় অন্যের ক্ষতি হয়, যে রসিকতায় অন্যে বিপদে পড়তে পারে, এমন ঠাট্টা রসিকতা যে করে সে নেহাৎ মূর্খ।’ খেজুর রসের হাঁড়ি পাড়তে গিয়ে পা পিছলে রামহরি মাথা ফাটালে ইন্টি-বিন্টিরা যেভাবে তাকে শুশ্রূষা করেছে তাকে উৎসাহিত করে দীনু খুড়ো একটা শিক্ষা দেন- ‘আহতদের সেবা করাটা একটা মস্ত বড় ধর্ম।’ এরই রেশ ধরে এসেছে মানবেতর জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের গল্পটি। হতচ্ছাড়া দাসুটা তার গুলতি দিয়ে একটা চড়ুই পাখির ছানাকে আহত করলেখুড়ো তাকে তিরস্কার করে বলেন- ‘কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী সকলেরই প্রাণ আছে, তাদেরও সুখ-দুঃখ আছে। আঘাত করলে আমাদের যেমন লাগে, এদের ঠিক তেমন লাগে। নিরীহ অসহায় প্রাণীর উপর জুলুম করা মোটেই বীরত্ব নয়, - এতে ভগবান অসন্তুষ্ট হন।’ ইন্টি-বিন্টির আসরের শেষ এপিসোড থেকে লেখক সম্পর্কে একটা ধারণায় আসা যায়। অনুমান করা যায় তাঁর এই জীবনদর্শনের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কেও। শেষ আখ্যানটিতে আছে মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ, আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার প্রসঙ্গ। জাতির জনক তিনি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো তাই কেবল মানবতাকে সম্মান জানানো নয়, জাতির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা। তাঁর আর্দশে দীক্ষিত হয়ে একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞাই ধ্বনিত হয়েছে ইন্টিবিণতিদের মুখে। এর থেকে বোঝা যায়, সত্য ও অহিংসার পূজারী গান্ধীজির আদর্শে দীক্ষিত সুনির্মল কল্যাণময় জীবনচর্যার ধারণাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বাংলার অজস্র শিশু-কিশোরদের স্ফুত হৃদয়ে। সাহিত্য তাঁর কাছে বিলাসের কিংবা নিছক অবসর যাপনের উপকরণ ছিল না, তা একই সঙ্গে হয়ে উঠেছিল আনন্দ ও শিক্ষার সুষম সমন্বয়।

ঔষধ ও আহার্যের এমনই সুমিত তো আগেও দেখা গিয়েছিল এদেশে ও বিদেশের ‘কথা’ (tale) –ধর্মী গল্পে। প্রাচীন ভারতে একদা বিষ্ণু শর্মার ‘পঞ্চতন্ত্র’ খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, যেমনটা লক্ষ করা যায় পশ্চিমের মাটিতে ‘ঈশপস্‌ ফেব্‌লসে’-র ক্ষেত্রে। সুনির্মল বসু সেই বহু পরিচিত পশুকথা-প্রাণিকথাগুলোকে নতুন আঙ্গিকে উপহার স্বরূপ তুলে দিলেন বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে। ‘সিঙ্গীর মামা ভোম্বলদাস’-এ সেই বোকা সিংহকে খুঁজে পাওয়া যায়, যে শারীরিক শক্তিতে খুবই বলীয়ান, কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষের ধুরন্ধ্রর বুদ্ধির কাছে কাবু। কুয়োর জলে নিজের ছায়া দেখে বিভ্রান্ত এক সিংহ কীভাবে জলে লাফিয়ে পড়ে বোকামির দণ্ড স্বরূপ নিজের জীবন বিপন্ন করেছিল তার চেনা গল্পটি এখানে সরস করে বর্ণনা করেছিল সুনির্মল। সরস করার কৌশল হিসেবে মাঝে মধ্যে ব্যবহার করেছেন টুকরো টুকরো ছড়া, যাতে পরিচিত গল্পটি কথনভঙ্গির দৌলতে একটু আলাদা ঠেকে। এই একই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, ‘সেয়ানে সেয়ানে’, ‘দুই বন্ধু’, ‘অকেজো ঘোড়ার কীর্তি’, ‘বাঘ আর শিয়াল’, ‘মামা আর ভাগ্নে’, ‘বাঘ জামাই’, ‘চুরির সাজা’, ‘বুদ্ধির দৌড়’, ‘বাঘের বিয়ে’, ‘উচিৎ সাজা’, প্রভৃতি গল্পে। গল্পগুলোর ভাষা একেবারেই আটপৌরে, মুখের ভাষা; লেখা হয়েছে যেন কাউকে শোনানোর জন্য। তাই ভাষার ভিতরে কোথাও পন্ডিতিয়ানার ছাপ নেই। বাক্যগুলো সংক্ষিপ্ত। শব্দগুলো হালকা। গদ্যের বিবৃতি থামিয়ে মাঝে মধ্যে ছন্দোনিপুণ ছড়াকার নেমে এসেছেন গল্পের চৌহদ্দিতে, দু-চার পংক্তি মুক্তো ঝরিয়ে আবার হঠাৎ উধাও। এইসব টুকরো টুকরো ছড়াগুলোকে মনোহারী কিছু নকশার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়, যা চেনা গল্পের সাদা জমিতে রঙিন ডিজাইনের মতো বোনা, যার আকর্ষণে গল্পপাঠক তরতর করে এগিয়ে চলে সমাপ্তির দিকে। কয়েকটা গল্প থেকে দু’চারটে দৃষ্টান্ত তুলে দিই ;

১। তোমার ছেলে আমায় খাবে, তাতেই আমি রাজি,

কিন্তু আছে একটা কথা, জানিয়ে দেব আজি।

২। কে তুমি ভাই হঠাৎ এসে ধরলে আমার লাঠি,

খোঁড়া মানুষ লাঠি ছাড়া কেমন করে হাঁটি।

৩। কিচির মিচির কিচি, মিথ্যে কেন ছি ছি –

দিচ্ছ আমায় দোষ এ বড় আফশোস !

ছোট্ট টুনি পাখি বেগুনগাছে থাকি;

বেগুন গাছের বাসায় আমি গুনগুনিয়ে গাই

নাচি-হাসি খেয়াল মত চটছো কেন ভাই?

৪। কিচ্‌ কিচ্‌ কিচ্‌ কিচ্‌ শোন তুই পক্ষী,

মুখপুড়ী হতভাগী, চেহারা অলক্ষী।

কেমনি স্বভাব তোর কদাকার মূর্তি,

বে-রসিক কি বুঝবি রসিকের স্ফূর্তি!

৫। থ্যাবড়া-নাকী, ড্যাবড়া আঁখি, ক্যাব্‌লা পাখি পেঁচা,

যতই পারিস সেখান থেকে সাধ্য মতন চেঁচা।

ভূতের মতন ভূতুম পেঁচা – বুদ্ধিটারও অভাব,

পরের ভালো দেখতে পারিস্‌ - জানাই আছে স্বভাব।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল একটাই, ছন্দের তাল ও অন্ত্যের মিলের ক্ষেত্রে অসম্ভব নৈপুন্যের অধিকারী সুনির্মল ছড়াগুলোকে ব্যবহার করেছেন পশু-পাখি-জন্তু-জানোয়ারদের মুখে, কখনোই মূল গল্পের বিবৃতিতে তিনি ছড়াকে প্রয়োগ করেননি।

এমনই চম্পূ-রীতির (গদ্যে-পদ্যে মেশানো ঢঙ) আর একটি করুণ-মধুর কিশোরোপযোগী ছোট্ট সিরিজ লিখেছিলেন সুনির্মল ‘কানাকড়ির খাতা’ নাম দিয়ে। চমৎকার উপভোগ্য এক রচনা। কানাকড়ি একটি কিশোর বালক, যার মধ্যে সাহিত্যচর্চার প্রচণ্ড আবেগ ও অস্ফুট প্রতিভা বর্তমান। সে ঘরের কোণে বসে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে কবিতা লেখা অভ্যাস করে ‘মৌচাক’-এ পাঠাবে বলে। কবি হবার তার বড় শখ। নানা কাগজে বারংবার লেখা পাঠিয়েও যখন তার একটাও কবিতা ছাপা হয় না, তবু সে দমে যায় না। তার দাদা এককড়ি ঘাটালে ঘন্টেশ্বরী চাল আড়তের আড়তদার। সে এসব কাব্য টাব্য বোঝে না, বুঝতে চায় না। তাই ভাইয়ের কল্পনা-বিলাসিতা এককড়ির কাছে নেহাত আনাড়ির কর্ম। ভাইকে ধরে এককড়ি একদিন শাসিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু তাতে কি! কানাকড়ি কিছুতেই দমবার পাত্র নয়। সে লিখে চলে মিল দেওয়া কবিতা, মিল না দেওয়া কবিতা। তার চারপাশে যা কিছু ঘটছে বাস্তবে সেই তার কবিতার বিষয়। নিজের সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা-মন্দলাগা ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ছন্দ মিলিয়ে সে লিখে চলে একটার পর একটা পদ্য। কেউ পড়ুক আর না পড়ুক। কবিতা রচনার ব্যাপারে সে এমনই একনিষ্ঠ। সব প্রতিভার উন্মেষ পর্বটুকু বুঝি কাটে অন্যের লেখা মকশো করে। কানাকড়ির ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। একদিন খেলনা তীর-ধনুক দিয়ে আকষ্মাৎ একটি কাঠবিড়ালীকে মেরে ফেলে তার মনে ভয়ানক দুঃখ হয়। সেই শোকে সে একটি কাব্য লিখে ফেলে – ‘কাঠবিড়ালীবধ কাব্য’। ধবনিসাদৃশ্যে মনে পড়বে মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ –এর নাম। তার ছন্দও তদনুযায়ী অমিত্রাক্ষর। যথেষ্ট বাস্তব বেদনায় ভরা সেই রচনা। অনুকরণের পরের পর্বে ... কানাকাড়ির আদর্শ হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ‘দুই বিঘা জমি’-র ছন্দের তালে দুলিয়ে সে তার নিজের জীবনের একটি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। চুপিসাড়ে গাছ থেকে পেড়ে আনা দুটি আম খাবার জন্য যখন সে প্রস্তুত, সেই মুহূর্তে তার দাদা হাত থেকে তা কেড়ে নিল। কবি কানাকড়ি লিখছে –

‘আমি কেঁদে সারা, চোখে ঝরে ধারা, মাথা গেল মোর ঘুরে

আমি আম পাড়ি, দাদা খায় কাড়ি, আঁঠি গায়ে মারে ছুঁড়ে।’

এ ধরণের ‘কপিবুক’-এর পর্যায়ে পেরিয়ে কানাকাড়ি এবার লিখতে থাকে স্বাধীন ভাব ও ছন্দের কবিতা। তার বোন নেড়ীকে একদিন বিছেতে কামড়ালে ছন্দ মিলিয়ে কানাকড়ি লিখে ফেলে সাড়ে তিন লাইনের কবিতা যার শুরুটা এইরকম –

‘ওরে বিছে কেন মিছে কামড়ালি নেড়ীরে?

ছোট মেয়ে বলে বুঝি এত তেড়ি বেড়িরে?’...

বাকিটা আর শেষ করতে পারেনি সে। দাদা এককড়ির রাম-গাঁট্টায় ভাবটা তার বোঁ-বোঁ করে হাউয়ের মতো কোথায় হারিয়ে যায়। কানাকড়ি কবিতা মক্‌সো করতো একটা কালো মলাটের খাতায়। সেটাও তার কুচুটে দাদার বৈরিতার কারণে কোথায় যে লোপাট হয়ে গেল তার কোন খোঁজই পেল না সে। এত দুঃখেও তবু কানাকড়ি লেখা ছাড়েনি। তার ভারি ইচ্ছে কবিতা লিখে ‘মৌচাক’-এর পাঠকের সঙ্গে আলাপ করবে। সেই ভাব জমানোর উদ্দেশ্য ছোট্ট পাঠক-পাঠিকের কাছে তার সংক্ষিপ্ত নিবেদন –

‘কানাকাড়ি নামটি আমার সামান্য মোর প্রতিভা

শোনাই যদি কাব্য আমার তাইতে কাহার ক্ষতি বা?

মৌচাকেরই পাতায় দেখি গল্প এবং কবিতা, -

যেমনি লেখা তেমনি ছাপা মন মাতানো সবই তা। ...

দয়া করে আমার লেখা যদি বেরোয় ছাপাতে

কানাকড়ি থাকবে তবে হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে।’

এভাবেই এগিয়ে চলেছে কানাকড়ির খাতা পাতার পর পাতা। কিশোর মনস্তত্ত্বের একেবারে গভীরে প্রবেশ করে সুনির্মল এই গদ্য ও পদ্যের মিশেল দিয়ে লিখেছেন কান্না-হাসির দোলা দোলানো জীবন-নাট্যের পালা। কল্পিত অথচ অতি সম্ভব এই চরিত্রটিকে তিনি করে তুলেছেন স্বভাব-কবি। কবিতার বিষয় নির্বাচনে কানাকড়ির কোন ওঁচামি নেই। যা তার বাস্তব অভিজ্ঞতার জগৎ সেখান থেকে সে বিষয় বাছাই করে নেয়। থুড়ি, ভুল হল কথাটা। বাস্তব ঘটনাই আপন আবেদনের গুণে কানাকড়ির কলমের ডগায় স্বচ্ছন্দ কবিতা হয়ে দেখা দেয়। নেড়ির অসুর সম-শ্বশুর, উড়োজাহাজে করে রবীন্দ্রনাথের পারস্যে যাওয়া, তার দাদার প্রিয় হুঁকো কলকে ভেঙে যাওয়া কিংবা নিতান্ত ভোজের উপকরণ ফুলকপি কানাকড়ির হাতে কবিতা হয়ে ওঠে। আর কবিতাগুলোও নিছক বস্তুধর্মী কবিতা নয়, রীতিমত ‘সাব্জেকটিভ’ কবিতা, যেখানে রচয়িতার ব্যক্তি-অনুভূতি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একালের পাঠকের রসাস্বাদনের জন্য কানাকড়ির কাব্য-সায়র থেকে অকিঞ্চিৎকর মাত্র দু’-চার বিন্দু :

১। নেড়ীর শ্বশুর –

চেহারাটা কদাকার – স্বভাব পশুর

নেড়ী কাঁদাকাটি করে

নিয়ে গেল তারে ধরে’, -

সীতারে হরিল যেন রাবণ অসুর।

২। দাদার হুঁকো কল্‌কে রে

ভাঙ্গল তোদের বল কে রে ?

যখন দাদা প্রাণ ভরে

গুড়ুক গুড়ুক টানতো রে –

উঠতো যে সুর তার টানে

সেতার বীণা হার মানে।

৩। মাথা ভরা চুল তোর ‘নেড়ী’ নাম তবু

এত অবিচার আমি হেরি নাই কভু!

মাথে কভু ‘বেণী’ নাই দাদার শালার –

তবু দেখ বেণী নাম রেখেছে তাহার।

৪। ওরে ওরে শকুনি,

ছোঁ মারিয়া কেড়ে কুড়ে

বোঁ করিয়া গেলি উড়ে

তুই খাবি জিভে গজা

আমি খাব বকুনি।

৫। ছিপ দিয়ে ধরিলাম সর-পুঁটিরে,

মহানন্দে এক ছুটে যাই কুটিরে

দাদা বলে সত্বরে - “এসেছে নেড়ীর বর,

এই মাছ ভেজে আজ দে’ তো দুটি রে-

জামাইয়ের যেন নাহি হয় ত্রুটিরে।”

আমি ধরিলাম মাছ- হোল তা খাবার,

দাদা ও নেড়ীর বর করিল সাবাড়;

আমি বসে এক থাল খাই খালি ভাত ডাল,

দাদা বলে, “ফের কাল ধরিস আবার,-

কালকেই চলে যাবে- ছুটি যে কাবার।”

এমনই আরো অজস্র কবিত্বের মণি-মাণিক্যের টুকরো ছড়ানো। স্থানাভাবে উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা গেল। এই কানাকড়ি সিরিজেই লেখা হয়েছে ‘কানাকড়ির আরো কবিতা’, ‘কানাকড়ি মরে নাই’, ‘কানাকড়ির প্রতিভা’, ‘সহজ কবি কানাকড়ি’, ‘কানাকড়ির ছন্দজ্ঞান’ ইত্যাদি কৌতুক ও বিষাদের মিশেল দেওয়া টুকরো টুকরো গল্প। ধারাবাহিক রচনার মধ্যে যেমন ক্রমপারম্পর্য থাকে, থাকে বিবর্তন ধর্মের অস্তিত্ব, এ গল্পগুলোতেও সেই একই লক্ষণ প্রকাশিত। কানাকড়ির সহজ ও স্বভাবকবি করে তুলেছেন সুনির্মল, যার কবিতার মধ্যে কোন ভাঁড়ামি নেই, লোক-কবিতাগুলোকেও অনাড়ম্বর, কাঁচের মতো স্বচ্ছ, স্পষ্ট। কানাকড়ির সহজ সরল প্রাণের আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে তার রচিত কবিতায়। মনে প্রশ্ন জাগে, এই কানাকড়ি কি নিছক কল্পিত চরিত্র, নাকি তার স্রষ্টা স্বয়ং? অবোধ সরল বালক-বালিকাদের নির্মল আনন্দে ভরিয়ে দেবার নিপুণ দক্ষতা যাঁর তালুবন্দী? সহজ গদ্য আর অনাবিল স্বচ্ছন্দ পদ্যকে এমন অক্লেশে মিলিয়ে দেবার দক্ষতা খুব কম জনের লেখাতেই মেলে। সুনির্মল বসু সেই শিশু-সাহিত্যিকদের অন্যতম, যাঁরা কচিমনের নিভৃত খবরটুকু জেনে তাদের আনন্দের, বিচিত্র অনুভূতির নিত্যসাথী হতে চেয়েছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি ছোটগল্প : ক্ষুধার্ত আর নামহীনদের মিছিল

ড. শ্রাবনী পাল

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

‘মাংস’ গল্পটির কথাই ধরা যাক্‌। বিভুপদ ঘরামির কাশ রোগ, শরীর দুর্বল, মাঝে মাঝে গলা দিয়ে রক্তের ছিটে বেরোয়। সরকারি হাসপাতালের ওষুধ খেয়েও সারে না। তারা পুষ্টিকর খাবার খেতে বলে। কিন্তু ইদানীং কাজ তেমন জোটে না বিভুর। দিনের পর দিন যদি সে বাড়িতে বসে থাকে তাহলে স্ত্রী সন্তানেরা খাবে কী ? বিভুর বউ সুরবালা। সে নিজে উপার্জনের চেষ্টা করেনি এমন নয়। বাবুদের পাড়ায় মুড়ি ভাজা বাসন মাজা ঘর সাফ্‌ সুতরো করার কাজ করেছে। তাতে সংসারের সুরাহা বিশেষ কিছু হয়নি।

বাড়িতে ঘটি বাটি যা ছিল সব বিক্রি হয়ে গেছে। বিক্রি করার মতন আর কিছুই নেই। শুধু সুরোর গায়ের মাংস ছাড়া। এত অনাহারেও সুরোর শরীর একেবারে চিমসে্‌ হয়ে যায়নি। মা হয়ে সে সন্তানের জন্য এইটুকু করতে পারবে না ?

এই ভাবনা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় সুরবালা, পারতে তো তাকে হবেই। নিজের দেহের মাংসের বিনিময়ে যদি তার সন্তানেরা খেয়ে-পরে বাঁচে ! এইপর্যন্ত হয়তো গল্পের ছকটা খুব অচেনা নয়। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) যখন দেখান যে বিভু ঘরামি তার স্ত্রী- সন্তানের নিয়েই একেবারে পৌঁছে যায় বে-পাড়ার দরজায়, তখন এতদিনের ব্যবসা- চালানো কর্ত্রী পর্যন্ত অবাক হয়ে সুরোকে বলে-

ছেলেমেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ? তাদের সঙ্গে এনিচিস?

এ কেমন ধারা আক্কেল ? এসব হল পাপী- তাপীদের জায়গা।

গুন্ডা- বদমায়েশরা ঘোরাফেরা করে, ছোটো বাচ্চাদের এখান থেকে

দূরে রাখতে হয়। এইটুকু অন্তত ধম্মোজ্ঞান তো থাকবে।

ওরে, এখানকার রাক্কোসরা সাত বছরের বাচ্চা মেয়েকেও খেয়ে

ফেলতে চায়।

অনটন আর ক্ষুধা যে কোথায় নিয়ে গেছে এই পরিবারটিকে, তার দৃষ্টান্ত বোধহয় সুরোর এই যাজ্ঞা---- ‘কাজে’ যোগ না দিয়েই সে মাসির কাছে চেয়েছে অগ্রিম টাকা-

আমার আজই টাকার খুব দরকার। ...

ছেলেমেয়েগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের হাতে কিছু না দিতে পারলে কাল ওদের কিছু খাওয়া জুটবে না। ... দয়া করো। ...

এই অসহায়তায় নিয়ম ভাঙে মাসি। চাল-আলু আর কেঁদে-ওঠা ছোটুর জন্য লজেঞ্চুস কেনার টাকা দিয়ে লাইনে ফিরে যায় সুরো, স্বেচ্ছায়। বলে যায়- ‘হ্যাঁ, ফিরে আসব।’ সে কি পারবে? স্বেচ্ছায় ফিরতে পারবে সুরো? উত্তর জানা নেই। বিভু আবার এলে সুরোর দেখা পাবে? আর ছেলেমেয়েরা যে জানল তাদের মা মামারবাড়িতে গেছে, কতদিন এইটুকু জেনে খুশি থাকতে পারবে তারা? এইরকম আরো কিছু প্রশ্নচিহ্ন রেখে সুনীল গল্প শেষ করেন, কিংবা বলা যায় আর একটা নতুন গল্পের সূচনা হয় এইভাবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখালিখির সূত্রপাত কবিতার মধ্যে দিয়ে, শুধু কবিতার জন্যই অমরত্ব তাচ্ছিল্য করতে পাড়ার দুঃসাহস তাঁর ছিল। পরে লিখতে শুরু করেছেন গদ্য। পত্রিকার পৃষ্টায় বেহস কিছু গল্পও ছাপা হয়েছে। গল্প- উপন্যাস লেখার ব্যাপারে সুনীলের কয়েকটি অকপট স্বীকারোক্তি আছে। ‘ভালোবাসা’ (১৯৮৬) গল্প- সংকলনের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন-

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন যে আমার গল্প- উপন্যাসগুলি সত্য ঘটনা না কাল্পনিক। পুরোপুরি কোনো কাল্পনিক কাহিনী আমার কলমে ঠিক আসে না। নিজের জীবনেরই কোনো না কোনও ঘটনা থেকে আমি কাহিনী নির্মান শুরু করি। তারপর কলমের ডগায় কল্পনা এসে ভর করে, চেনা নারী পুরুষের পাশাপাশি চলে আসে নতুন মানুষ। যে ঘটনা হয়তো ঘটেছিল কোনো শুকনো নদীর ধারে, স্মৃতিতে তা’ অনেক সময় মনে হয় যেন কানায় কানায় পূর্ন।

‘অর্ধেক জীবন’ (২০০২) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ভাবনার সাক্ষী। তাঁর গল্প- উপন্যাসের উৎস নিহিত রয়েছে এই আত্মজৈবনিক আখ্যানে। নিজের জীবনে একটা সময়ে কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল তাঁকে, আত্মজীবনীতে এমন কছু ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বভাবতই আসে ‘মাংস’ গল্পে যে ক্ষুধার ছবি আছে, দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামীন জীবনের যে অসহায়তার ছবি আছে তার পরিচয় কোথায় পেয়েছিলেন লেখক? তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত। ‘মাংস’ গল্পটির রচনাকাল উল্লেখিত হয়নি, কিন্তু যে অনাহার আর অ-সুখের ছবি রয়েছে তার বাস্তবতাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। এরকমই এক প্রচণ্ড ক্ষুধার ছবি আছে ‘খিদে’গল্পে। তোলাবাজ পুলিসকে মেরে বিজুর বাবা জেলে। দাদা পাঁচদিন আগে গেছে যাত্রাদলের থেকে বাবার পাওনা আদায় করতে। তার ফেরার সম্ভাবনা ক্রমশ সংশয়ের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে চাল নেই, একফোঁটা তেল নেই, শুধু নুন আর কাঁচালঙ্কা। তা দিয়ে আর কতখানি কলমি শাক খাওয়া যায় ? অতএব খিদে পেলে জল খওয়া । কিন্তু সেখানেও এক বিপত্তি-

জল খেলেই পেট ব্যথা করবে বিজু জানতো। হ্যাঁ, ঠিক শুরু হয়েছে। যেদিন থেকে ভাত খাওয়া বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকেই এরকম। খালি পেটে অনেকখানি জল খেলে পেটটা ভর্তি হয়ে ফুলে যায় বটে, তারপরই ব্যথা শুরু হয়। পেট ব্যথা হলেই মনটা আরও খারাপ হয়ে যায়।

অবেশেষে বিজু খিদে মেটায় পুকুরপাড়ে পাথরের খোঁদলে মৃতবৎসা স্বামী-পরিত্যক্তা ননীপিসির বুকের ফেলে দেওয়া দুধে, নোনতা নোনতা লাগছে, তবু বিজুর শরীর যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটিতে অতিনাটকীয়তা আছে, যৌনতাও আছে যেখানে কিশোর বিজুর ক্ষুধার্ত মুখটি নিজের উন্মুক্ত দুধেল বুকে টেনে নিয়ে ননীপিসি বলেছে – ‘খিদে পেয়েছে, খা।’ কিন্তু তার থেকেও বেশি আছে বোধহয় বিজু আর তার বোন পুতুলের খিদের জ্বালায় পেট চেপে শুয়ে থাকার ছবি।

বস্তুত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহে এই ধরণের গ্রমীন নিম্নবিত্তের ক্ষুধার ছবি কিছুটা ব্যতিক্রমী বলেই চিহ্নিত হতে পারে। একসময়, বিশেষত দুয়ের দশকের মাঝামাঝি যে ধরণের গল্পের জন্য সুনীলের জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁয়েছিল তার মূলে ছিল নারী-পুরুষের বিশেষত তরুণ-তরুণীর প্রেমের অবাধ উচ্ছ্বাস, সামাজিক বন্ধনের পাশাপাশি যাবতীয় বন্ধনহীনতার প্রতি দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। ভালোবাসার একটা বিশুদ্ধ রূপ যেন সুনীলের গল্পে কাব্যময় একটা আবহ তৈরি করেছিল। ‘আগামীকাল’ গল্পে তপন-সুবর্ণা-রণজয়- ভাস্বতী এদের কাছে ভালোবাসা ও বিবাহের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে। যেখানে তারা ভালোবাসা বা বিবাহিত জীবনের ভালোবাসার বাইরেও প্রেমের একটা মুক্ত জায়গা চায় যেখানে সবাই সবাইকে একটা ‘স্পেস’ দেবে। অন্তত বান্ধবীকে তিন-চারটে চুমু খেলে একদা প্রেমিকা অধুনা স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবে না। সমস্ত গল্পটার মধ্যে লঘু কৌতুকের সুর একটা আছে হয়তো, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে গেছে গল্পের শেষাংশ যেখানে-

হঠাৎ কথা থামিয়ে পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। সেই দৃষ্টি চিরকালের।

অর্থাৎ সমস্ত বন্ধনহীন্তার মধ্যেও যে আধুনিক প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ভালোবাসার চিরন্তনতাকেই স্বীকার করে নিচ্ছে এমন ইঙ্গিতে ঐতিহ্য আধুনিকতা স্বপ্ন-বাস্তবের যে গাঁটছাট বাঁধা হচ্ছে সেই বিষয়টি সমকালে একটা আলাদা উৎসাহ ও কৌতহল তৈরি করেছিল। নীল্লোহিতের মধ্যে অনেকেই দিক্‌শূন্যপুরের অভিযাত্রী হয়ে ছা-পোষা জীবনের বাইরে একটা অন্য মানে খুঁজতে চেয়েছিল। পাঠকের মনে পড়বে ভু-আলোকিত ‘মনীষার দুই প্রেমিক’ গল্পের কথা যেখানে ধনী প্রতিষ্ঠিত অথচ কাপুরুষ প্রেমিকের বিপরীতে বেকার প্রেমিকের প্রেমিকাকে দূর থেকে দেখার তৃপ্তিকে সুনীল চমৎকার ভাবে ধরে দিয়েছেন। প্রেমের এই মানসিকতায় নতুনত্ব যেমন, কাব্যময়তাও তেমনই, এইরকম আরও কিছু গল্পের নাম করা যায় যেখানে প্রেমের নানান আবেগকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে সুনীলের স্বভাবোচিত একটা বেপরোয়া মনোভাব কাজ করেছে। কিন্তু এরই পাশে যখন পড়ি ‘নাম নেই’- এর মতো গল্প তখন বোঝা যায় রোমান্টিক ভাববিলাসের বাইরে জীবনকে কত গভীরভাবে তিনি চিনতেন।

‘নাম নেই’ গল্পটি লেখা উত্তম পুরুষে, মেদিনীপুরের দিকে জঙ্গল দেখতে গিয়েছেন দুই বন্ধু। জায়গাটা বেশ সুন্দর-

চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়, মাঝখানে খানিকটা চালি উপত্যকা, সেখানে একটা লাল রঙের নদি। ... লাল রঙের মাটি ধুয়ে ধুয়ে আসে বলে জলের রং ... অনেকটা গেরুয়া গেরুয়া।

ঝর্ণার ধারে বসে থাকা দুই বন্ধু দেখলেন দশ-এগার বছরের এক ছাগল চরানো ছেলেকে। তার মুখটি বেশ সুন্দর, ডাকলেও সে এল না কাছে। চৌকিদার জানালো ঐ ছেলেটি মহাদেব মাহাতোর ভাতুয়া। ছেলেটি বোবা, কথা বলতে পারে না। কেউ ওর নাম দেয়নি, কেউ ডাকে ছোঁড়া, কেউ বলে বোবা। সন্ধ্যার সময় একদল গ্রামবাসী এসে জানতে চায় তাদের কাছে বন্দুক আছে কি না। বন্দুক দরকার হাতি তাড়ানোর জন্য।

প্রত্যেকবারই এইখানে একপাল হাতি আসে ফসল খাবার জন্য। এ বছর খরা, তাই জমিতে এখনও ফসল বোনা হয়নি, সেইজন্য হাতিরা এসে ফসল নষ্ট করার সুযোগ না পেয়ে ক্ষেপে গেছে।

শহুরে দুই বন্ধু জঙ্গলে এসে হাতির খবর পেয়ে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। তাদের কাছে যা কৌতূহল আর উত্তেজনা, গ্রামের অসহায় মানুষগুলোর কাছে তা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ। চৌকিদার জানায় একজনকে পাঠানো হয়েছে বাঁশপাহাড়ীতে, থানায় খবর দেওয়ার জন্য। কথক চমকে ওঠে – রাত্রিবেলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একা যে গেল সে বিপন্ন হবে না তো ! জানতে পারে – যে গেছে সে ঐ বোবা ছেলেটার বাবা – সে ও ভাতুয়া। ভাতুয়া ভাতের বিনিময়ে কোন বাড়িতে কাজ করে তারা, একধরনের ক্রীতদাস, Bonded labour, খেতে পায় বলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থানায় খবর দিতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে তারা বাধ্য, চুক্তিবদ্ধ। বক্তা জানতে পারে, এই গণাই গুরু মুখিয়ার ভাতুয়া, বোবা ছোঁড়াটা তার মাহাতোর ভাতুয়া, এমনকি গণাই এর বৌ-ও ভাতুয়া, একটুকরো জমি আর বাড়ি ছিল ওদের, মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বসান্ত ওরা ভাতুয়ার জীবনে চলে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে-

বাড়ি নেই, সংসার নেই, তবু একটা পরিবার আছে মাঝে মাঝে দেখা হয় নিশ্চয় ওদের। তখন কী কথা হয়?

তিনটি পৃথক পরিবারে ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন করে এক পরিবারের তিনজন। যাদের জীবনের কোনো দাম নেই। নেই বলেই মৃত্যুকে সঙ্গে করে তাদের পেরোতে হয় মঙ্গলের পথ। আর্থ-সামাজিক একটা সংকট এইসব ভাতুয়াদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বোবা ছেলেটি তাই নাম পায় না। দামও পায় কি ? তাদের জমি বাড়ি হারানো অনিকেত জীবন, তার প্রেক্ষিতে থাকে এই ভাতুয়ার জীবন। এই ভাবনার জাগরণে ভেঙে যায় নাগরিকের প্রকৃতি–সম্ভোগের কল্পনা–বিলাস। এই ভাঙনটুকু কিন্তু কাহিনীর মূল্যবান অংশ। গল্পকারও বোধহয় জানেন নাগরিকের ভাববিলাসী দৃষ্টিতে ঐ বোবা ছেলেটির মনের ভাব ধরা দেবে না। এই অনন্বয়ের বোধটুকু নিয়েই গল্প – কথকের স্বীকারোক্তি-

গাছের আড়াল থেকে সে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল । কী ভাবছিল কে জানে ?

মনুষ্যেতর প্রানীর মতো মানুষের এই যাপনকে কিংবা টিঁকে থাকাকে গল্পকার পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়ে জীবনের এক কঠিন সত্যকে উপস্থাপন করেন।

নাম ছিল সেই লোধা ছেলেটির, কিন্তু জীবনের দাম পেল না সে। পাঠকের মনে পড়বে ‘পাখির মা’ গল্পটির কথা। পরিযায়ী পাখিদের ঝাঁক আসে প্রতিবছর পঙ্গুঁ অর্থবান বন্দুকওয়ালা জগদীশের বাড়ির উঠোনের শিরিষগাছে। গ্রামের লোক ওদের অথিতি বলে মানে। কিন্তু লোধাদের ঐ ছেলেটা, ডুলুং, খিদের জ্বালায় সে মারে সারসের এক শাবককে। সারারাত ধরে কাঁদে পাখির মা। তারপর উড়ে যায় তারা ‘কঁক কঁক ডাকের মধ্যে যেন ঝরে পড়ছে অভিমান।’ সাঁওতালরা ভিড় করীল, এ লোধাদের কাজ, লোধা ছেলেটি জগদীশের বাড়িতে কাজ করে খেয়ে আস্কারা পেয়েছে – এমন কথাও উঠল। একটা পাখির মৃত্যু তাদের উত্তেজিত করল। সন্ধ্যার পর পাঁচশো লোকের একটা দল টাঙ্গিঁ–বল্লম নিয়ে চড়াও হল লোধাদের গ্রামে। পাখির মাংস খেয়েছিল অনেকেই। কিন্তু তারা প্রথমেই এগিয়ে দিল ডুলুংকে।

প্রথমে শাবলের বাড়ি খেয়ে সে ছিটকে পড়ল মাটিতে, বাচ্চা সারসটার মতনই সে হ্যাঁচোড় হ্যাঁচোড় করে পালাবার চেষ্টা করল, পারল না।

আরও কয়েকজনকে খুন–জখম করে ওরা চলে গেল । আড়াই দিন পর পুলিশ এসে ‘পঙ্গুঁ’ অতএব ‘নির্দোষ’ জগদীশের বাড়িতে বসে চা খেয়ে চলে গেল। পার্টির দৌলতে জামিন পেয়ে গেল সাঁওতালরা, লোধাদের তুলনায় ওরা সংখ্যায় বেশি যে ! দিন চলে তার নিজস্ব গতিতে। জগদীশের কিশোরী মেয়ে কমলা শুধু ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠে, সে যেন দেখতে পায় ঝাঁকড়া শিরিষের মগডালে বসা এক কৃষাঙ্গ যুবককে, যে দু’হাত বাড়িয়ে, বলছে ‘এই সব জঙ্গল আমার’। বিনিদ্র রাতে জগদীশ শুনতে পায় পাখির মায়ের কান্না। সেবারের শীতে আসে না পরিযায়ী পাখিরা, জঙ্গল থেকে খালি হাতে ফিরে আসে সাঁওতালরা। আর গতবার যে পেঁপে গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিলেন ডুলুং কিছু কাজ আর খাবারের আশায়, সেখানে এবার এসে দাঁড়ায় এক ছিন্নবস জরতী বুড়ি, ফ্যাসফেসে গলায় প্রাণপণ চেষ্টায় সে কি যেন বলতে চেষ্টা করে- বলে ‘এটুকু ... মুড়ি’। পাখির মায়ের কান্না যাদেরকে জাগিয়ে রাখে, তাদের কি নাড়িয়ে দেবে ডুলুং-এর মায়ের এই আর্তনাদ ! তীব্র সংবেদী এই প্রশ্নকে রেখে গল্প শেষ করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ক্ষুধার্ত এক লোধা ছেলের পাখি শিকার ও নির্মম হত্যা এই গল্পের শরীরে এক করূণ বেদনার পাড় বুনে দিয়েছে। লোধা ছেলেটির বুভুক্ষা ও জীবনবাসনা যে কোথাও কোন মূল্য পেল না, পরিযায়ী পাখিদের মতোই তার আহার্য সন্ধানে আসা ও চলে যাওয়া এই বিষয়টিকে গল্পকার সমীকৃত করে দিয়েছেন জগদীশের উঠোনের গাছে আসা পাখির ঝাঁকের সঙ্গে। পাখির দলকে অতিথি হিসেবে বরণ করে তারা, আর তাচ্ছিল্যে তাড়িয়ে দেয় লোধা ছেলেটিকে, তারা যে ‘চোর’। এইভাবে বৈপরীত্যে আর সাদৃশ্যে গল্পটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

খিদের প্রচণ্ডতা যে মানুষকে কতখানি সংস্কারগ্রস্ত কতখানি হিংস্র করে তুলতে পারে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত সুনীলের ‘গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প।’ গ্রামের দরিদ্র অভুক্ত মানুষগুলোর কাছে ভূত ধরে দিলে দশটা করে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় সুরেন্দ্র। দলবল নিয়ে যে গ্রামের পথে ঘোরে গান গেয়ে –

ভূতের নাতি ভূতের পুতি বুড়ো হাবড়া ছোঁড়াছুঁড়ি

যেমন তেমন ভূত পেলে ভাই হবে না আর ছাড়াছাড়ি।

মামদো ভূত বা ব্রক্ষ্মদত্যি

দেখাও যদি তিন সত্যি

দশটি করে টাকা পাবে হাতে হাতে দোকানদারি,

সেই টাকায় খাও মণ্ডা মিঠাই করে সবে কাড়াকাড়ি।

ভূত যে ধরা যায় না সেটা সুরেন্দ্র ভালোভাবেই জানে। তবু সে এই রাস্তা নিয়েছে বহুদিনের জমানো রাগ আর ক্ষোভ থেকে। তার বাবাকে ভূতে গলা টিপে মেরেছিল। সেদিন তার বাবার ট্যাঁকে ধান-বেচা টাকা ছিল। তার এক আধলাও পাওয়া যায়নি। কে নিয়েছিল সেই টাকা ? আত্মা না পরমাত্মা ? কার বেশি টাকার দরকার? –এইসব প্রশ্ন সুরেন্দ্র করে। গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষগুলোর ভূতকেন্দ্রিক সংস্কারকেই হয়তো সে এইভাবে আঘাত করতে চায়। সমগ্র গল্প জুড়ে ফ্যান্টাসি আর কঠিন বাস্তবের দ্বন্দ্ব। সর্বানন্দের পুত্রবধূ শান্তিকে পেত্নি ধরেছে বলে সুবল ওঝা বিস্তর মারধর করে। সুরেন হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত গর্ভবতী মেয়েটিকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ভূত ধরে টাকা পায়না কেউ। টাকার স্বপ্ন নিবারণকে ক্রমশ ক্লিষ্ট করতে থাকে। খাবার জোটে না তার। কলমিশাক সেদ্ধ আর ফ্যান ভাত দিয়ে ক’দিন চলে। অন্ধকার রাতে অবিরাম বৃষ্টির শব্দে ঘুম আসে না অভুক্ত নিবারণের। দূরে বেরিয়ে পড়েছে ভূত কেনার দল। কানে আসছে টাকার কথা। নিরুপায় নিবারণ তার বুড়ো বাপকে জিজ্ঞাসা করে ভূত দেখেছে কি না। যারা অপঘাতে মরে তারা ভূত হয়। পবন মরলে ভূত হবে, তাহলে নিবারণের অর্থাগম নিশ্চিত। অন্ধকারে নিবারণের চেহারাটা আরও বড় দেখায়। ছেলের মনোগত ইচ্ছার কথা বুঝতে পারে পবন, কিন্তু তারপরই চিৎকার আর কান্না মিশিয়ে সে বলে ওঠে –

ও বাবা নেবারণ আমাকে মারিস না, আর দুটো দিন অন্তত বাঁচতে দে, ... একটু গরম গরম ভাত দিস ... দুটো দিন একটু পেট ভরে খাই ... ও বাবা নেবারণ, তোর পায়ে পড়ি... আর দুটো দিন একটু গরম ভাত ...

একদিকে পেটের জ্বালায় বাবকে মারবার গোপন নিষ্ঠুর অভিপ্রায়, অন্যদিকে মরবার আগে পেটের জ্বালা মিটিয়ে গরম ভাত খাবার দুর্মর বাসনা আর মরে ভূত হয়ে তবেই ছেলের রোজগারের সুযোগ করে দেবার জন্য বাবার করুণ ইচ্ছে এই দুয়ে মিলে সমস্ত গল্পটিকে মর্মান্তিক করে তুলেছে। ভূত ধরা ভূতের তেলে ওষুধ ইত্যাদি কথায় গল্পে একটা অ-বাস্তব পটভূমি তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ দরিদ্র মানুষগুলোর কর্মহীনতা, কুসংস্কার, বুভুক্ষা আর বাঁচবার স্বপ্ন কোনও অলীককল্পনা নেই। রোমান্টিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রিয়ালিজমের বোধ যে কত গভীর ও সত্য, এই গল্পে যেন তার প্রমাণ আছে

‘ইরফান আলি দু নম্বর’ গল্পটিতেও ওদের কথা, গ্রামের দিনমজুর দরিদ্র মানুষগুলোর খিদের কথা। ইরফান আলি ভাগ চাষ করে। কিন্তু বছরে পাঁচ মাস দেশে কাজ থাকে না। তখন সে এদিক ওদিক জনমজুরির খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। জুটলে খায়, না জুটলে উপোস। সেবার গ্রামে বাঁধ কাটার কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিদিন শ’দেড়েক লোক নেওয়া হয়। রোজ কাজ পায় না সবাই, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডাকা হয়। সাড়ে তিনটাকা রোজ আর দুপুরে পাঁচখানা করে রূটি ও একটুকরো গুড়। ঐ খাবারটুকুর জন্য অপেক্ষা। গ্রামে আরেকজন ইরফান আলি থাকায় গল্পের মূল চরিত্রের নাম হয়ে গেছে দু’নম্বর ইরফান আলি। এক নম্বর নেতা গোছের, চেহারা ভালো, বাবুদের নেকনজরে থাকায় কুলির সর্দার হয়েছে। আর দু’নম্বর রোগা রোগা চেহারার, রুখ দাড়ি, চোখে সবসময় ভিতু ভিতু ভাব। যেন কোনওরকমে বেঁচে থাকা একজন মানুষ। গত পাঁচদিন একবেলা খাবার জুটেছে দু,নম্বরের। কোনোমতে আজকের কাজটা জোগাড় করেছে সে। ঘোষবাবু বলেছে ‘ঐ কোনোদিন এক নম্বর হতে পারবে না।’ কথাটা কানে লেগে রইল দু’নম্বরের। প্রায় অভুক্ত শীর্ণ শরীরে একটুখানি কোদাল চালিয়েই হাঁফিয়ে ওঠে সে, দম নিতে চায়, দুপুরের খাবারের জন্য অপেক্ষা করে। এক নম্বর হাঁকিয়ে দিয়ে বলে বিড়ি খাওয়া, কাজে ফাঁকি দেওয়ার ছল, ‘গরমেণ্ট এমনই পয়সা দেবে?’ শ্রান্ত ক্লিষ্ট দু’নম্বরের হঠাৎ মনে হয়, তার জীবনের যা যা পাওয়ার কথা ছিল সবই ঐ এক নম্বরটা নিয়ে নিয়েছে। মাথা ঘুরে পড়ে যায় সে। কিন্তু কাজ শেষ না করে ফিরে গেলে খাবারটা পাবে না যে ! অন্তত একটা বিড়ি। আগুনটা চাইলে এক নম্বরের বিদ্রুপের হাসিতে আগুন জ্বলে যায় দু’নম্বরের। খিদের আগুনের সঙ্গে মিশে যায় অপমানের আগুন। হঠাৎ কি এক অন্ধ রাগে আর আক্রোশে সে হাতের কোদালটা বসিয়ে দেয়, এক নম্বর বলবান লোকটার মাথায়।

দেখা যাক, এবার সে এক নম্বর হতে পারে কি না। দীর্ঘসঞ্চিত বুভুক্ষা আর ক্ষোভ হঠাৎই ইরফান আলিকে বদলে দিল। ক্রমাগত না পাওয়ার হতাশা, দীর্ঘদিনের বঞ্চনা দু’নম্বরের চেতনায় অকস্মাৎ এমন একটা ঝাঁকি দিল যে সে একটি হত্যাকাণ্ডের অংশভাগী হয়ে গেল। গ্রামীণ দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের অসহায়তার পাশাপাশি তার অবিবেচক আত্মবিশ্বাসকেও কখনও এইভাবে চিহ্নিত করেন গল্পকার। পরিণাম জানে না সে, কিন্তু পড়ে যেতে যেতে এইভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিতু ভিতু রোগা চেহারার ইরফান আলি দু’নম্বর এক নম্বরকে প্রত্যাঘাত করে গেল।

বিধবা মুসলমান যুবতী স্বাস্থ্যবতী হলে তার বিড়ম্বনা যে কি হতে পারে তার ছবি রয়েছে ‘দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি’ গল্পে। স্বামী মারা যাবার পর তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে অসহায় হাসিনা। তাকে বিয়ে করতে সকলেই উৎসাহী, কিন্তু ছেলেমেয়েদের নিতে রাজি নয়। অতএব নানা স্তোকবাক্যে হাসিনার শরীর ভোগ করে তারা। বিশেষত, পাড়ার কাজকর্মে হাসিনার ডাক পড়ে এবং রহমান সাহেব অতিথিদের সামনে দাঁড় করিয়ে তার বয়স জিজ্ঞাসা করে। ত্রিশ বছরের হাসিনাকে ষোড়শী মনে হয়, এটা হাসিনারই অপরাধ। সুতরাং তাকে নিয়ে ‘খেলা’টা অনায়াসে খেলা যায়। পিতৃবন্ধু গণিচৌধুরীও হাসিনাতে উপগত হয়। শেষপর্যন্ত আরও একটি সন্তানের জন্ম দিতে প্রস্তুত হয় হাসিনা। তার ছেলেমেয়েদের ভিক্ষাবৃত্তিতে, হাসিনার পরের বাড়ি কাজ করে কিছু খাবার পাওয়ার ছবিতে অসহায়তা আছে। হাসিনার প্রতি পুরুষের আগ্রাসনে যৌনতাও কিছু কম নেই। তবু গল্পকার এখানে এক নারীর মাতৃত্বকে মূল্য দিয়েছেন। হাসিনার গর্ভ জানাজানি হলে পিতা লাল মিঞার আশ্রয় হারাতে হবে কি না জানা নেই, কিন্তু এখানে সন্তানের জন্য মায়ের লড়াইয়ের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। ‘মাংস’ গল্পে সুরবালা সন্তানদের জন্য বাধ্য হয়েছিল পতিতবৃত্তি গ্রহণে, এ যেমন আমরা দেখেছি, তেমনি ‘মাংস’ নামক আরেকটি গল্পে দেখব ঠিক ঝি কেষ্টর মা কীভাবে চারতলার বারান্দা থেকে টুবলুর খরগোশকে রাস্তার ফেলে দিয়েছে। আগের খরগোশটা এইভাবেই মরেছিল, তার মাংস খেয়েছিল কেষ্টর মা আর তার ছেলেমেয়েরা, ছেলেটা আর একটু চেয়েছিল। এম্নিতে সে বাবুদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করে না। কিন্তু বাবুরা একটার পরিবর্তে আরেকটা নিয়ে আসতে পারে, ফেলে-ছড়িয়ে খায়। আর কেষ্টর মায়ের সংসারে মাংস খাবার ‘উৎসব’ সেদিনই মাত্র হয়েছিল। একটা খরগোশ যদি চারতলার বারান্দা থেকে পড়ে মরতে পারে, তাহলে আরেকটা খরগোশেরও সেই পরিণতি অসম্ভব নয়। অতএব বাবুদের অনুপস্থিতিতে খরগোশটাকে ধরে কেষ্টর মা তার মুঠো আলগা করে দিল। ক্ষুধা যে মানুষের বোধকে কিভাবে গ্রাস করতে পারে, তার ন্যায়-অন্যায়ের ভাবনাকে পর্যুদস্ত করতে পারে এই গল্পে সুনীল তা দেখিয়েছেন।

উপন্যাস রচনায় সুনীলের দক্ষতা যেমন সংশয়াতীত, মধ্যবিত্ত চরিত্র রোমান্টিক প্রেমবিলাসিতা নিয়েও তাঁর গল্পের একটা সমৃদ্ধ ভুবন আছে। মনীষার দুই প্রেমিক, সিঁড়িতে পুজারী, রাতপাখি কিংবা পলাতক ও অনুসরণকারী ইত্যাদি গল্পে গল্পকার সুনীলের স্বতন্ত্রতা লক্ষণীয়। এর পাশাপাশি যখন তিনি ‘পুরী এক্সপ্রেসের রক্ষিতা’র মতো গল্প লেখেন তখন বোঝা যায় বিষয়গত বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম বাসিনী এক পাগলির যাপনের অনুপুঙ্খতাও সুনীলের কলমে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। মরিচঝাঁপি ফেরতা বানপুর স্টেশনে ‘নিক্ষিপ্ত’ পরিত্যক্ত এক নারী- ‘ওয়ান ডেসন্টিটিউট উয়োম্যান, অয়ালজেড টু বী এ রেফিউজি অ্যান্ড এ ডেজার্টার ফ্রম দা ডি ডি এ সেটেলমেণ্ট’- সরকারি চিঠিপত্রে এই তার পরিচয়। নামের অভাবে সে ‘পাগলি’। সে নির্বাক সে ভিক্ষে চায় না, শুধু পুরী এক্সপ্রেস এলে তার শরীর দুলতে থাকে। এই গল্পে লাটু, কেলুচর, বনমালী এমনকি নিরাপদকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন এপিসোড আছে। তাতে গল্পের সংহতি কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হয়েছে। তবে লাটুর মুখে ‘মা’ ডাক শুনে তার নিঃশব্দ কান্না স্পন্দিত শরীরের ছবিটি ভোলা যায় না। সেইসময় এক বিস্মৃত অতীতে জেগে উঠেছে ঐ পাগলি। প্ল্যাটফর্ম বাসীদের প্রাত্যহিকতার ক্ষুধা আর দীর্ঘশ্বাসও নাগরিক সুনীলের কান এড়ায়নি, বোঝা যায়। চোখ এড়ায়নি পার্ক স্ট্রীটের বাস গুমটির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গোলাপি- পাঁজরার হাড় বের করা রোগা চেহারা তার, আকাচা সস্তা পাট-সিল্কের শাড়ি পরণে, পায়ে রবারের চটি। সেদিন তার রোজগার মাত্র তিনটাকা। মাতালদের সঙ্গে জাহাজ ঘাটায় যেতে চায়নি আর কলেজের ছেলেটি দশ টাকা দিতে চাইলেও পুলিশ দেখে পালিয়েছে। বাড়িতে পাঁচখানা পেট হাঁ করে আছে, কালই রেশন তোলার শেষ দিন। সাহেববাড়িতে আয়ার কাজ করে ‘সম্মান’ টিকিয়ে রাখা গোলাপি পোশাক বদলে বাড়ি ফেরে। কবরখানা থেকে ফুল চুরি করে বিক্রি করে যে ফুলওয়ালা দীনু, সে গোলাপির হাতে বিক্রি না- হওয়া গলাপের তোড়াটা তুলে দেয়। রান্না করে খাওয়া যাবে না, হয়তো বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে ফেলেই দেবে– এই সাধারণ দৃশ্য থেকে সুনীল অনায়াসে একটি ‘চরিত্র’কে বের করে আনতে পারেন-

এখনকার বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয়, মধ্যরাতে ফুলের গুচ্ছ হাতে

নিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছে একজন নারী।

হোক না কবরখানা থেকে চুরি করা, তবুও তো ফুল। হোক না, না

খেতে পেয়ে দেহ বিক্রি করা একজন রাস্তার মেয়েছেলে। তবুও তো নারী। (ফুল ও নারী)

ক্ষুধার কাছে অসহায় দরিদ্র বিক্রীত মানুষগুলির ছবি এইভাবেই ফুটে উঠেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পে। সমাজে বঞ্চিত উপেক্ষিত ‘নাম নেই’ দের প্রাত্যহিক দিনাতিপাতের খুঁটিনাটি সুনীল সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ করেছেন, কিন্তু অতিরিক্ত ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দেওয়ায় তার অকৃত্রিমতা বজায় থেকেছে। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ শুধু নয়, সবরকম অবস্থার মধ্যে থেকেও তিনি মানুষের ভিতরকার মানুষকে দেখতে পারেন এবং দেখাতেও পারেন। সুনীলের বিস্তৃত গল্পভুবনে ইরফান আলি দু নম্বর, বিজু, ডুলুং, নিবারণ কিংবা পবন, হাসিনা কিংবা কেষ্টর মা-কে আপাতভাবে কখনও বিক্ষিত মনে হতে পারে। মনে হতে পারে ‘অতিথি’। কিন্তু গ্রাম-পরিবেশে দরিদ্র ক্ষুধার্ত মুমূর্ষু লোভী কিংবা ঘাতক চরিত্রকে সুনীল স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই উপস্থাপন করেন, বিশেষ কোনো পরিস্থিতি এমনকি না-পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি চরিত্রগুলির উদ্ভাস দেখাতে পারেন। হতে পারে, সাংবাদিকতার সূত্রে বিভিন্ন গ্রাম-পর্যটনে তাঁর মানসপটে গ্রামের এইসব সাধারণ অ-সাধারণ মানুষের ছবি মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল এই প্রসঙ্গে বাদল বসুর স্মৃতিচারণ উদ্ধার করা যাক্‌-

মনে পড়ছে, তখন সুশীল ছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। লোকসভা নির্বাচন কভার করতে অফিস পাঠিয়েছে সুনীলকে। প্রচণ্ড গরম। সাধারণ অ্যাম্বাসাডার গাড়ি নিয়ে ঘুরতে হবে গ্রামগঞ্জে। ... বম্বে রোড ধরা হল। প্রচণ্ড গরমে পিচ গলছে। আমরা গেলাম প্রথমে ডেবরা, তারপর গোপীবল্লভপুর। ৭০ দশকে নকশালপন্থীদের দুই বিখ্যাত ‘মুক্তাঞ্চল’। এই অঞ্চলেই আমার দেশের বাড়ি। ঝাড়গ্রামের দহিজুড়ি গ্রামে। ... অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা। দাওয়ায় খাটিয়া পেতে ঘুম। ভোরবেলা চা- জলখাবার খেয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম ভোটদাতাদের উদ্দেশ্য। সুবর্ণরেখা নদীর ধার দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ভোটের হালচাল জেনে নিচ্ছিল সুনীল। সাংবাদিকতার পাশাপাশি হয়তো সেদিন ওর মনে জমে উঠছিল সাহিত্যেরত উপাদান, যা পরে কখনও কাজে লাগবে ।

বেলপাহাড়ি হয়ে কাঁকরাঝোড়। অভাবী, খেটে খাওয়া মানুষদের সঙ্গেঁ

একাত্ম হয়ে তাদের মানসিকতা বুঝে নিচ্ছিল সুনীল।

(বাদল বসু : আমার পরমপ্রাপ্তি সুনীলের বন্ধুত্ব, বইয়ের দেশ,

জানুয়ারি- মার্চ ২০১৩, পৃ-৩৯)

এই স্মৃতিচারণায় তাহলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রাম সংযোগের একটা সূত্র পাওয়া গেল। গ্রামের দরিদ্র শ্রমজীবী নিত্য-শোষিত বুভুক্ষু মানুষগুলির সঙ্গে যোগাযোগের অভিক্ষতা সুনীলের সংবেদনায় জারিত হয়ে সাহিত্যের চরিত্র করে তুলেছিল তাদের। অথচ কোথাও আর্দশায়িত করে তোলার কোনো তাগিদ ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষ ভাঙাচোরা ঘরগেরস্থালির পটভূমিতেই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। বোহেমিয়ান শৃঙ্খল ভাঙ্গা জীবনের ‘আত্মপ্রকাশ’ নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, এইসব গ্রামকেন্দ্রিক গল্প নিয়ে তত চর্চা হয়নি। অথচ এই গল্পের পরিসরে এক অন্য সুনীলকে খুঁজে পাওয়া যায়। যাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ তীব্র হৃদয়ানুভূতি সাধারণ অভাবী খেটে-খাওয়া মানুষগুলির সঙ্গে একাত্মতা গল্পগুলিকে স্বতস্ত্র মাত্রা দিয়েছ। বিশেষত যখন সেই আন্তরিকতায় মিশেছে আত্মসমীক্ষার সুর তখন গল্প উত্তীর্ণ হয়েছে জীবন-সত্যে। ‘খরা’ গল্পটি এইসূত্রে উল্লোখযোগ্যতার দাবি রাখে।

নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের দল যে খরার জন্য বস্ত্রহীন অন্নহীন অবস্থায় মারা যাচ্ছে তার রিপোর্টিং –এর জন্য ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের বিখ্যাত সব কাগজের সাংবাদিকেরা জড়ো হয়েছে। তাদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় একটা দ্বিধায় দ্বন্দ্বে তারা আন্দোলিত। খরার দেশে এসে, খরার খবর আর ছবি তুলতে এসে পার্টি মদ্যপান এবং ‘মেয়েছেল’ কেন্দ্রিক অশ্লীল গল্পের মধ্যে থাকতে থাকতে কেউ কেউ ভাবছে কোনটা ট্রাজিক ? নিরন্ন মানুষের মৃত্যুর মিছিল ? নাকি তার রিপোর্টিং করতে এসে ‘পরের পয়সায় মদ মুরগি পেঁদিয়ে ... মেয়েছেলের গল্প’ করা আর খবরের কাগজের ভাষার নাটুকেপনা আতিশায্য নিয়ে সময় কাটানো? এইসব মর্মান্তিক দৃশ্যের ছবি তুলে বিদেশী কাগজে বেশি টাকায় বিক্রি করার ইঙ্গিতও আছে এখানে। বিহারের ‘ফিফটি ফোর পার্সেণ্ট’ ‘পপুলেশন ড্রট অ্যাফেক্‌টেড’, অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে আর সাংবাদিকরা সেই ‘স্টোরি কভার’ করতে এসে ডাকবাংলোয় ফেলে ছড়িয়ে ভাত মাংস খাচ্ছে। এমনই একটা ছবির মধ্যে বারবার জেগে ওঠে লাহিড়ীর কন্ঠস্বর ‘এখানে মেয়েছেলের গল্প হবে।’ খরাক্লিষ্ট দুর্গত মানুষের কথাকে সে বারবার থামিয়ে দিতে চায়। তার বিবেকের দংশন সে সহ্য করতে পারে না বলেই বারবার ফিরে যায় নারীশরীরের গল্পে। কিন্তু ক্রমশ তার সেই গল্প ‘ভাল্লাগে না’, হুইস্কিও আর ‘ভাল্লাগছে না’ এমনকি দ্বিপ্রহরিকা ভাতঘুমও অস্বস্তির মনে হয়। সে নেমে এসে ইঁদারার কাছে, ওঁরাও মেয়েদের থেকে জল নিয়ে মুখেচোখে ঝাপটা দেয়, আর্দালিকে সরিয়ে দিয়ে কুয়োর অনেক নিচের থেকে জল তুলে দিতে থাকে ওদের। আর যুবক সাংবাদিক অরুণের কথায় পাঠক পেয়ে যাবেন ‘অর্ধেক জীবন’এর সুনীলকে –

বাবা কলকাতায় মাস্টারি করতেন, সে আমলের ব্যাপার তো জানেন, বাবা মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে পাঠাতেন, তখন পূর্ববাংলায় আমাদের গ্রামের চালের মণ ছাপান্ন টাকা। বাড়িতে পাঁচজন লোক। সারাদিন একবার মাত্র ভাত আর ফ্যান মিশিয়ে- খাবার জুটতো মাদের। আর আলু সিদ্ধ। পকেটে আলুসিদ্ধ রাখতুম সবসময় – তখন ক্লাস ফোর এ পড়ি, স্কুলে গিয়েও পকেট থেকেও আলু সিদ্ধ বার করে খেতুম। ক্লাসের সব ছেলেই বাড়ি থেকে আলু সেদ্ধ আনত – বেঞ্চির উপর নুন, ... আমার সহ্য হত না, ... তবু খিদে, মাকে জ্বালাতুম, মা খেতে বসলে মায়ের খাবার কেড়ে খেতুম।

চল্লিশের সেই মৃত্যুর দশকে বুভুক্ষু মানুষের, নিরন্ন মানুষের ‘ফ্যান দাও’ আর্তনাদ আর কঙ্কালসার দেহের মৃত্যুর মিছিলের বাস্তব ছবি রয়েছে ‘অর্ধেক জীবন’- এ (অর্ধেক জীবন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ, ২০১২, পৃ-২৮, ৩০-৩১)। অন্নহীন মানুষের যন্ত্রণার এই আন্তরিক অনুভবে এই গল্প সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আর ‘অর্ধেক জীবন’ –এর কথক করে রাখে না, এমন সংবেদী বিবেকী উচ্চারণে তিনি হয়ে ওঠেন সম্পূর্ণ এক জীবনবৃত্তের এক সৎ সাহসী দ্রষ্টা, মরমী কথাকার।

দেশভাগ ও সমকালীন সংকট : বাংলা ছোটগল্প

ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট দেশভাগ ও স্বাধীন হয়েছিল একই সাথে। এই দেশভাগের স্মৃতিচারণায় যেন আমাদের বাষ্পহীন আবেগ প্রবাহিত হয়। যার উৎস আছে বিস্তার নেই, প্রাবল্য আছে তীব্রতা নেই। এখানে যদি বলি বিভাজন ও সম্প্রদায়গত বিভেদ ছিল একটি পারস্পরিক সরল সমীকরণ তবে অত্যুক্তি করা হয় না। আজ সর্বজনস্বীকৃত এই যে, দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এই বিভাজন হয়েছিল। এবং এই দ্বি-জাতি তত্ত্ব মেনে নেওয়ার অর্থ হল – বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার পিছনে যে উদার স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা ব্রিটিশ বিরোধী শহীদদের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তা দেশভাগের নামে উৎসর্গীকৃত। কেননা প্রত্যক্ষ স্বাধীন্তাকামীরা সাম্প্রদায়িকতা এবং বিভাজনের ঊর্দ্ধে যেতে পারেন নি। এই মর্মে বলে রাখা ভালো কোন ব্যক্তি বিশেষকে সাম্প্রদায়িক চিহ্নিতকরণ আমার অভিপ্রায় নয়। তবে একথাও ঠিক দেশভাগ আকাশ থেকে পড়া একটি সমস্যা নয়। তবু কেন এই সাম্প্রদায়িক ভেদ নিয়ে ভূ-খণ্ডজনিত বিভেদ? রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন – ‘আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু মুসলমানের মাঝখানে একটি বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।’১ আশ্চর্যের বিষয় হ’ল এই দুটি সম্প্রদায়ই তাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সময়ও সেই বিরুদ্ধতা সুন্দরভাবে অটুট রেখেছিল। আসলে এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে প্রয়োজন ছিল সমস্ত রকম ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আপোসমীমাংসা; কিন্তু আপোসমীমাংসা তো দূরের কথা তাদের সম্পর্কের খামতির জায়গাটিও অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়নি। বরং দুই ভিন্ন সম্প্রদায় যাতে দুই বিপরীত কোটিতে অবস্থান করে সে প্রক্রিয়ার পিছনে প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। এখন প্রশ্ন হল তবে মদতদাতা কারা? প্রথম মদতদাতা ব্রিটিশরাজ, যারা দু’পক্ষকেই উস্কানি দিয়েছে। আর দ্বিতীয় মদতদাতারা হলেন দুই বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের যুগযুগান্তরের নেতৃস্থানীয় মৌলবাদী ব্যক্তিবর্গ। যাদের বিরোধের তুল্য-মূল্যের ভরতুকি দিতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। সাধারণ মানুষ সেই জের টেনে টেনে আজও অন্তহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত।

এযাবৎ আমরা যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ নিয়ে কথাগুলো বলেছি, প্রাথমিকভাবে ‘সম্প্রদায়’ বলতে অনুভূতিটা অন্য রকম ছিল। তখন communal বা সম্প্রদায় বলতে বোঝান হ’ত ‘সেক্ট’। কিন্তু বর্তমানে এই জাতি নির্দেশবাচক শব্দটিকে গন্ধহীনভাবে ব্যবহার করেত পারি না। এর লক্ষ্য এখন অন্য কোন – অন্য কোন সুচিন্তিত অর্থকে বহন করে বা খোঁজে। হিন্দু-মুসলমানের এই আন্তরিক দ্বিত্বটাকে অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ‘যে বাঁচায়’ গল্পটিতে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেখানে দুই বন্ধু চরিত্রের আলাপচারিতায় হিন্দু-মুসলিমে ঠিক কোথায় ফারাক সেদিকে দিক্‌পাত করেছেন – ‘আপনারা যখন ধ্বনি দেন হিন্দু-মুসলিম এক হো তার মানে কি এই নয় যে, হিন্দু-মুসলিম এক নয় ? হিন্দুত্ব ও ইসলাম এক নয়। গীতা-কোরান এক নয়। যা এক নয় তা এক হবে কি করে ? এক হতে পারে ? কখনো ? হিন্দু-মুসলিম বরাবরই দুই ছিল, বরাবরই দুই থাকবে। তাদের একত্বটা স্বপ্ন, তাদের দ্বিত্বটাই বাস্তব।’২ লক্ষণীয় অন্নদাশঙ্করের গল্পের চরিত্রের বক্তব্যে যে দ্বিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সেখানে ধর্মীয় দ্বিত্বটাই প্রকাশিত, মানুষে মানুষে সম্পর্ক শুধু যেন ধর্মের ভিত্তিতে, ধর্ম ছাড়া মানুষের মানবিকতারও সেখানে প্রশ্রয় নেই। এই ধর্মীয় প্রাধান্যেই তৈরী হয় সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা, যাকে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক কার্ল মার্কস বলেছেন – ‘ধর্ম হল জনগণের আফিম।’ যে আফিম খেয়ে মানুষ মত্ত হয়ে মানবিকতাকে বির্সজন দেয়। ভারতীয় উপমহাদেশে দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিকতার অবমূল্যায়ণ কতটা হয়েছিল ইতিহাস তার প্রমাণ রেখেছে। পরবর্তীতেও যে এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা ছোটগল্পের অন্দরমহলেও যে দেশভাগ ও সমকালীন সংঘর্ষের চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, দুই বাংলার গল্পগুলি আলোচনা করলেই দেখা যাবে। নাটক, উপন্যাসগুলির মতো রূপ ও রূপান্তরের মাধ্যমে গল্পগুলি এগিয়ে গেছে। একটি মাত্র আবেগ নিয়ে গল্পগুলি থেমে থাকে নি, সময় তথা সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুলিও রূপান্তরিত হয়েছে। এই ধারার গল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হল গল্প রচয়িতার প্রাথমিক স্তরের পরে সমাজের সরাসরি বাস্তব চিত্রকে লীন করে দিয়ে মানুষের অন্তর্জগৎ ব্যাখ্যানে প্রয়াস স্বীকার করেছেন। বাংলা গল্পের এই দ্রুত অগ্রগতির চিহ্ন লক্ষ্য করা যাবে বিভিন্ন পর্যায়ের গল্পগুলি আলোচনার মাধ্যমে। সমকালীন সংকটের প্রেক্ষিতে আলোচনার খাতিরে দুই বাংলার গল্প সৃষ্টির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো দুই বাংলাতেই একই রকম ছিল, ফলে সেখানে বসবাসকারী জনমানসকে অনেক বেশী সমস্যা ভোগ করেই সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। দেশভাগের সাহিত্যালোচনায় সমালোচকেরা প্রাথমিকভাবে যে কথাটা বলে থাকেন সেটি হল দেশভাগের সাহিত্য বিশেষ সৃষ্টি হয়নি অর্থাৎ যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নি। হলেও সুচিহ্নিত প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্য নেই। সমালোচকদের এই উক্তিকে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যতটা হয়েছে সেটাই বা কম কিসের। দেশ তখনও স্বাধীন হয় নি, উপমহাদেশের চারিদিকে মহামারির মতো শুরু হয়ে গেছে রক্তলোভী পিশাচদের ধারাল অস্ত্রসহ আগুন নিয়ে খেলা, সেই সময়ে যে সাহিত্যে রচিত হয়েছে, সেই রক্তে-লেখা সাহিত্য সমাজের বাস্তব চিত্র প্রদর্শন করেছে। কখনো সেই চিত্রে ফুটে উঠেছে মানবিকতার ছোঁয়া। শিল্প ও গঠন কাঠামোর বৈচিত্র্যের চাইতে লেখকেরা নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন জান্তব চিত্রটিকে তুলে ধরতে। এমনই একটি গল্পরূপ পাই সোমেন চন্দের ‘দাঙ্গা’ গল্পটিতে। গল্পটি সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। এক অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যে শক্তি কলম লেখক ধরেছেন তাতে দ্বিমত নেই। এখানে ‘হত্যা’কে হত্যা বলেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। গল্পের প্রথমেই লক্ষ্য করি অস্থিচর্মসার এক বৃদ্ধ ময়লা ধূতি পরে উদ্বেগের সঙ্গেই মাঠ পার হচ্ছিল। চকিতেই দুটি হিংস্র যুবক এসে কোন রকম বাক্য বিনিময় না করেই বৃদ্ধের পেটে ভোজাল ঢুকিয়ে দেয়। নিহত ব্যক্তি হিন্দু কি মুসলিম এমন কোন নির্দেশ গল্পে নেই। একজন মানুষের হনন ঘটছে ওপর একজন হিংস্র মানবিক হৃদয়হীন অশুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে। সেখানে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক সেটা বড় ব্যাপার নয়। মনবতার অপমৃত্যুই প্রধান। এর চাইতে নির্দয় চিত্র এই গল্পের শেষে আছে ; সেটা আরো পীড়াদায়ক। কোন ব্যক্তি, নারী কি পুরুষ, হিন্দু কি মুসলিম, নিহত হয়েছে তার চিহ্ন মাত্র নেই, আছে শুধু রক্তের দাগ। গল্পের শেষে আছে – ‘কার দেহ থেকে এই রক্তপাত ঘটেছে কে জানে ?’ ভয়ার্ত মানুষ লাশের কোন হদিশ দিতে পারেনি, সমগ্র গল্পটি এই রকম খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সমরেশ বসুর ‘আদাব’ গল্পটিও অসাধারণ। গল্পের মানবিক রস বিতরণ একটু ভিন্ন ধরণের, ফলে গল্পটিও সমালোচকমহলে বিশেষ দক্ষতার গল্প বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। গল্পটি ‘দাঙ্গা’ তাড়িত সময়ের প্রেক্ষিতের। সর্বত্র ১৪৪ ধারা আর কারফিউ জারি করা হয়েছে। দাঙ্গা বেঁধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই বেঁধেছে দা, কুড়ুল, ছুরি নিয়ে। দুই পক্ষের লোকই উন্মত্ত হয়ে আছে। এরই মাঝে একজন সুতামজুর ও একজন মাঝি আত্মরক্ষার জন্য গা ঢাকা দিতে গিয়ে একই জায়গায় উপস্থিত হয়। প্রাথমিকভাবে এরা ব্যক্তিগত পরিচয় দিতে ভীত হলেও পরবর্তী ঘটনাক্রমে তারা সেই পরিচয়কে উন্মোচন করেছেন। উভয়েই উভয়ের কুশল কামনায় ব্রতী হয়েছেন কিভাবে এই দুর্মর প্রাণনাশক লীলা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। ধীরা ধীরে তারা যখন একটি নিরাপদ আশ্রয়ে এসেছেন, মাঝিভাই আর অপেক্ষা করতে চাননি – যেহেতু পরের দিন ঈদ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি স্নেহ তাকে ঐ ভয়ার্ত নিঃস্তব্ধতা আটকে রাখতে পারে নি। মাঝি যখন সুতামজুরকে ‘আদাব’ জানিয়ে চলে যান সুতামজুরের মনে তখন এক অকৃত্রিম মানবিক প্রেমের উদয় হয়, তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন করেন – ‘ভগবান মাঝি য্যান বিপদে না পড়ে।’ মনে মনে সুতামজুর অনুভব করেছেন এই বুঝি মাঝি বাড়ি পৌঁছে স্ত্রী- পুত্র- কন্যার আদর খাচ্ছেন ; তখনই গুলির শব্দে রাত্রির বুকে সুতামজুরের জবানীতে মাঝির কাতর উক্তি উদ্বেলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে- ‘মাঝি বলেছে পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিন। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল তাগো কাছে।’ এক দিকে এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য এক সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে, আবার সুতামজুর ও মাঝি দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও মানবিকতার আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। এই সময়ের গল্পে এমন তরতাজা হিংসাত্মক গল্প অনেক পাওয়া যাবে। এই পর্বের গল্পের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লেখকেরা জীবন্ত চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন বেশি পরিমাণে, কেননা মানুষ কি করবে, কি করবে না সেরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরী হয় নি। মানুষের হাহাকার ও মানবিকতার অপমৃত্যুই প্রাধান্য পেয়েছে। এই সময়ে আরো যে সমস্ত গল্পকারের গল্প সমকালীন বাস্তবতায় মুখর হয়ে উঠেছিল তা হ’ল- অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘পতাকা’, মনোজ বসুর ‘ইয়াসিন মিয়া’, সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘নেড়ে’ ; এছাড়া এম.এম.বজলুল হকের ‘ভাগ না দিয়ে ভাগ’, রসিদ করিমের ‘ভাই ভাই ঠাই ঠাই’ ইত্যাদি গল্প।

১৯৪৭ সালে দেশ যখন বিভক্ত হয়ে পড়ে, সামাজিক অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। এই বিভাগ পরবর্তী গল্পগুলিতে সমাজের অস্থিরতা সরাসরি উঠে আসতে থাকে। সমাজে তখন রাসায়নিক সাম্যের ন্যায় মানুষের অদলবদল হতে থাকে। মানুষ অনুভব করে ফেলে তাদের প্রধান সমস্যাটা কি। চারিদিকে দাঙ্গা, উদ্বাস্তুস্ত্রোত, অর্থনৈতিক সামাজিক ও পারিবারিক নানা বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধেরও অবসান ঘটতে থাকে। মানুষ হারিয়ে ফেলে তার আত্মপরিচয়। আত্মঅভিজ্ঞান সন্ধানের বিন্দুমাত্র সুযোগ তাদের থেকে না। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ মানুষের জায়গা বদলের একটি প্রধান সুযোগ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দিল্লি থেকে করাচি, করাচি থেকে দিল্লি, পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গ, এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিকে মানুষের ঢল, চারিদিকে হাহাকার আর উদ্বাস্তু শিবির সমগ্র উপমহাদেশের জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

দুইবাংলার ছোটগল্পগুলিতেই পরিপূবর্ণভাবে এই চিত্র উঠে এসেছে। প্রথম পর্বের গল্পের সঙ্গে এই পর্বের গল্পের একটি প্রধান পার্থক্য হল দেশভাগ পূর্বের গল্পে ভূ-খণ্ডজনিত বিভেদ ছিল না। মানুষের সামগ্রিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে যত বড় ঘটনাই ঘটুক না কেন দেশ বিভাগের চাইতে বড় নয়। এই সময়ে দুই বাংলার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকের গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে- পশ্চিমবঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের ‘স্ফটিকপাত্র’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ইজ্জৎ’, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার’, মনোজ বসুর ‘মানুষ’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উপায়’, সতীনাথ ভাদুড়ির ‘গণনায়ক’, সমরেশ বসুর ‘নিমাইয়ের দেশত্যাগ’, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জটায়ু’, দেবেশ রায়ের ‘উদ্বাস্তু’, নরেন্দ্রনাথ মিত্রর ‘পালঙ্ক’; পূর্ববঙ্গে আবদুল গাফফার চৌধুরীর ‘স্বাক্ষর’, আবু জাহাঙ্গীরের ‘পুনর্ব্বাসন’, মোহাম্মদ আবদুল মদিজের ‘রিকশওয়ালা’, আতোয়ার রহমানের ‘বুদ্বুদ’, গোপাল বিশ্বাসের ‘বেসুরো’, মহীউদ্দিনের ‘ভিড়’, শামসুদ্দিন আবুল কালামের ‘কালো রাত্রির ভোর’। আরো অনেক গল্পকারের উৎকৃষ্ট গল্পের উদাহরণ অনিচ্ছাকৃতই দেওয়া গেল না। এই পর্বের একটি গল্পের আলোচনা করলে বিষয়টা লক্ষ্য করা যাবে যে, মানুষ ধীরে ধীরে থিতু হতে চাইছে, নিজেকে সন্ধান করতে চাইছে। দেবেশ রায়ের ‘উদ্বাস্তু’ গল্পটিতে আমরা গল্প রচনার একটা নতুন পদ্ধতি লক্ষ্য করি। গল্পে লেখক প্রথমেই একটা বিজ্ঞাপন জারি করেছেন, - ‘... সব দেশের ভূগোল ও ইতিহাস এক গুরুতর পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে যে, কে যে কে সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত জানার উপায় নেই। আমরা এক তথ্য সংগ্রহ অভিযানের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি যে, পৃথিবী গ্রহে বর্তমানে বহু ফেরারি ও বেনামি ব্যক্তি আছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, উত্তর ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, পূর্ব জার্মানি, পশ্চিম জার্মানি ইত্যাদি দেশগুলোতে। সে কারণে ‘খাঁটি ব্যক্তি সন্ধান’ নামক রাষ্ট্র সংঘের কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমরা সমস্ত দেশেই যে যা বলে পরিচিত, সে তা কিনা তা পরীক্ষা করছি। এবং বিশ্ববাসীকে অনুরোধ করছি তারা যেন স্ব –স্ব আত্মপরিচয় দিয়ে নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দেন।’

এই বিশেষ পরিবর্তনজনিত কারণে কতগুলি প্রশ্ন উঁকি মেরে ওঠে-

ক। ভূগোল ও ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে।

খ’ ‘কে যে কে’ সে বিষয়ে স্থির করে বা নিশ্চিত করে জানার উপায় নেই।

গ। বর্তমানে বহু ফেরারি ও বেনামি ব্যক্তি আছে।

ঘ। বিশেষ করে যে দেশগুলোতে ভারতবর্ষ পাকিস্তান... ।

ঙ। খাঁটি ব্যক্তি সন্ধান।

চ। যে যা বলে পরিচিত সে তা কিনা।

উপরি উল্লিখিত কারণগুলি একটি দেশের প্রধান সমস্যা। আলোচ্য ‘উদ্বাস্তু’ গল্পটিতেও এই ধরণের সমস্যাও আছে। গল্পের নায়ক সত্যব্রত লাহিড়ির বাড়িতে থানা থেকে লোক এসে হাজির যে তাকে অবিলম্বে থানায় গিয়ে দেখা করতে হবে, হতচকিত স্ত্রী অণিমার মুহুর্মুহু প্রশ্নে সত্যব্রত জানান – ‘জানো, আমারা আমরা কিনা – তার খোঁজ খবর নেবার জন্য – গর্ভমেণ্ট নাকি থানায় অর্ডার দিয়েছে, তাই থানায় যেতে হবে। ‘থানায় যেতে যেতে হবে তোমাকে কেন?’ আমি যে আমি এটা প্রমাণ দিতে।’ উদ্বাস্তুরা কখনো প্রমাণ দিতে পারে না তার নাগরিকত্ব বা পরিচয় কী। গল্পের নায়ক সত্যব্রত লাহিড়িও পারেনি।

নায়কের সঠিক সন্ধানে দেখা যায় যে সত্যব্রত লাহিড়ী, পিতা মৃত পূণ্যব্রত লাহিড়ী আসলে শেখ মনসুর আলি পিতা মৃত কদম শেখ। এই লতাতন্তুর বিসর্পিল জটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে অণিমা-এনামুলের ঘটনা। ফলে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে সত্যব্রত কি সত্যিই সত্যব্রত ? কিম্বা অণিমা কি সত্যিই অণিমা ? স্বরূপের যন্ত্রণায় তাই প্রশ্ন ওঠে অণিমা কে ? উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে যে প্রশ্ন প্রথম ও প্রধান। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন – ‘আমি কে ? শুধু এই প্রশ্ন নয় – আমরা কে ? বাস্তুহারা ? উদ্বাস্তু ? আশ্র্য়প্রার্থী ? শরণার্থী ? ছিন্নমূল ? ফরেনের (নেহেরু বলেছিলেন) ? রিফ্যুজি ? কি তার পরিচয়।’৩ দেবেশ রায়ের এই গল্পটি প্রমাণ করে দেয় মানুষের স্বাভাবিক উৎকন্ঠা স্তিমিত হওয়ার দিকে অগ্রসর হলেও তারা যে আরোও নানারকম সমস্যাজর্জরিত একথা সত্য। দেশভাগের গল্প রচনায় তাই একটি বিষয় স্পষ্ট– দেশভাগের আগে ও পরের গল্পগুলির মধ্যে সমাজজীবনের পরিবর্তন সুন্দরভাবে ধৃত হয়েছে। প্রাথমিক পর্বের গল্পগুলিতে সাধারণ মানুষ একটি নিশ্চিত দুশ্চিন্তার সম্ভাব্যতায় ভুগেছিল, মনের কোণে দুরাশার অন্ধকার জমেছিল, দেশভাগ সেই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে হাজির হয়েছিল, সমকালের বাস্তব চিত্রটি তারা অনুধাবন করতে পেরেছিল তথা দু’চোখ ভরে অবগাহন করেছিল – সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপর্য্যের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত বিপর্যয়টা কী।

ষাটের দশকের পরবর্তীতে যে গল্পগুলি রচিত হয়েছিল তার আবেদন একেবারেই ভিন্ন ধরণের। একটি ক্ষতস্থান প্রাথমিকভাবে দগ্‌দগে থাকে, আস্তে আস্তে ক্ষতের ব্যথা নিরাময় হতে থাকে। কিন্তু ক্ষত যদি বারে বারে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তবে তা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বুকে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ তেমনই একটি ঘটনা। তবে ১৯৪৬ থেকে ’৫০ সালের মধ্যে দুই বাংলা এবং ভারতবর্ষের অন্যত্র যে দাঙ্গা হয়েছে তার চাইতে বেশি হিংসাত্মক ঘটনা আর কখনো ঘটে নি, দু’একটা বিচ্ছিন্ন দাঙ্গা ছাড়া। উদ্বাস্তু মানুষ জায়গা বদল করে একটা শান্তির নীড় প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু স্মৃতির মণিকোঠায় সেই দুর্বিষহ বেদনা জমাট করে রেখেছে। এই পর্বের যে সমস্ত গল্পকার তাদের গল্পগুলির মাধ্যমে সময়ের তথা মানুষের স্মৃতিমেদুর ভীতিকে প্রকাশিত করেছেন সেগুলি নিম্নলিখিত – অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালনেমি’, অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘অধিরমসূতপুত্র’, প্রফুল্ল রায়ের ‘রাজা যায় রাজা আসে’, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘তোমার উদ্দেশ্যে’, কিন্নর রায়ের ‘উপমহাদেশ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘দীন-ইলাহি’। বাংলাদেশের গল্পকারদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’, হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবীগাছ’, হায়াৎ মাসুমের ‘অবিনাশের মৃত্যু’ এবং আরোও গল্পকার তাদের মাধ্যমে মানসিক প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করেছেন।

প্রথমেই কিন্নর রায়ের ‘উপমহাদেশ’ গল্পটিকে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হল। এই গল্পটিতে প্রকাশিত হয়েছে উপমহাদেশের প্রধান সমস্যা কী ? উপমহাদেশের প্রধান সমস্যা হল নাম ও গোত্র। অনেকেই জীবনে বেঁচে থাকার জন্য কিম্বা জীবনে বেঁচে থেকে জীবিকা অর্জনের জন্য নাম ও গোত্রের পরিবর্তন করেছে। বর্তমান গল্পের আবর্তন যাকে নিয়ে সে রহমতুল্লা অরফে রাধেশ্যাম পটুয়া শিল্পী। গল্পের প্রথমেই লেখক একটি মিথ-এর ব্যবহারের মাধ্যমে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। পুরাণে কথিত আছে যারা চিত্রকর তারা যেন দুই রকম ব্যবহারই প্রকাশ করে- ‘তোরা মুসলমানের সব নিয়ম মেনে চলবি। ছবি আঁকবি হিন্দু দেবদেবীর। মূর্তি গড়বি গান বাঁধবি।’ রাধেশ্যাম এমনই একজন চরিত্র। যার নাম রাধেশ্যাম ওরফে রহমতুল্লা। তাঁর স্ত্রী শাঁখা সিঁদুর বিক্রি করে, তারও ভোটের কার্ডে নাম খালেদা। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে তাদের জীবনযাত্রা। এক সময় পটুয়া শিল্পীদের ছবির চাহিদা বেশ কমে যায়। রাধেশ্যাম শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন লোক তার চেনাজানা। ঘটনাক্রমে একদিন বিজ্ঞাপন কোম্পানীর মালিক সুকুমারবাবুর সঙ্গে তার দেখা হয় বিভিন্ন চিত্রের প্রদর্শনীর মাধ্যমে। সুকুমারবাবুর দুর্গার মূর্তি লে-আউট করে নিতে চাইলে রাত্রি বেড়ে যায় এবং সুকুমারবাবুর বাড়িতেই রাত্রি যাপন করে, এখানেই ঘটে মিরাকল। স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে স্ত্রী শ্রীলেখা জানতে পারে রাধ্যেশ্যাম মুসলমান। সেই মুহূর্তে শ্রীলেখার মুখ নিঃসৃত বাণী হল – ‘মুসলমান ! শ্রীলেখা প্রায় চমকে যায়। যেন বা আর্তস্বরেই বেজে ওঠে বিছানায় বসে। তার গভীরে আজন্ম লালিত সংস্কার। ঘৃণার বিষ – যা কিনা তার বাবার থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া - দেশভাগ- গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালি ... ।’ ‘বাবার থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া’ শব্দগুচ্ছই আমাদের চমকে দেয়। সুকুমারবাবু ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির মানুষ। তার কাছে হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদের চাইতে দুর্গাপুজোর কাজটি তুলে নেওয়াই জরুরী। কিন্তু স্ত্রী ছাড়বার পাত্রী নন। পূর্ব পুরুষের ঘৃণাকে স্মৃতির মণিকোঠায় জাগরুক করে রেখেছে। এবং সে শিল্পীর জাত নির্ণয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এমন আর একটি গল্প হল স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘দীন-ইলাহি’। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘলযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট সর্ব ধর্মের সমন্বয়ে এক নতুন ধর্মমতের সূত্রপাত করেছিলেন। সেখানে নির্দিষ্ট কোন ছোট বা বড় ধর্মের প্রাধাণ্য ছিল না। ভারতবর্ষের বুকে মহামতি আকবরই প্রথম ও শেষ সম্রাট যিনি ধর্মের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন। যে দেশে এই রকম ধর্মের প্রবর্তন হয় সে দেশে হিন্দু মুসলিম দুই বিপরীত ধর্মের বিবাহিত দম্পতির থাকার জায়গা হয় না, এর চাইতে বড় দুর্ঘটনা আর কি হতে পারে। সামাজিক রীতি-নীতির প্রক্রিয়াকরণে আমরা কি এখনও পর্যন্ত ততদূর আধুনিক হতে পেরেছি যেখানে সমাজের যেকোন শ্রেনীর মধ্যে হিন্দু-মুসলিম দুই বিপরীত ধর্মের শুভ যুগলবন্দীকে মেনে নেব ? আমরা উপরে উপরে বলে যাই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি চাই। একত্র সহাবস্থান চাই। কিন্তু আমাদের কি এখনও এই সংস্কারমুক্ত মন তৈরি হয়েছে? আসলে আমরা মনে প্রাণে কখনোই এই ধরনের সংযোগসূত্রকে মানতে পারবো না। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলেই বোঝা যায় এই ঘটনার কোন উপযুক্ত কারণ আছে কি না। এই গল্পে স্বাতী ও নুরুল পস্পরকে বিয়ে করেছে, কিন্তু একটা ঘর ভারা পায় না। অনেক ভালো ভালো ঘর পেলেও মুসলিম শোনামাত্রই তা বাতিল হয়ে যায়। অনেক কষ্ট করে তন্নতন্ন করে খুঁজে যদিও একটা পায়, বাড়ির গৃহকর্ত্রী হতভম্বের সুরে উচ্চারণ করেন- ‘মুসলমান। নু-রু-ল।’ এবং তিনি স্বাতীকে বলেছেন – ‘মুসলমান বিয়ে করলে ? জাননা ওরা আমাদের কিরকম মেরেছিল। কি না অত্যাচার করেছে।’ যিনি এই বক্তব্য রেখেছেন তিনি দেশভাগও দেখেননি, দাংগাও দেখেননি। অথচ পূর্বের গল্পটির মতোই স্মৃতি থেকে স্মরণীয় ক্ষোভকে উগরে দিয়েছেন।

এখানে বলে রাখা ভালো এই গল্পগুলোও দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত কিন্তু এই পর্যায়ের লেখকরা ঘটনার ঘনঘটা ছেড়ে মানুষের অন্তর্লোকে ডুব দিতে চেয়েছেন। বহির্জগত ও অন্তর্জগতের পার্থক্য উন্মোচিত হয়েছে এই সময়ের গল্পে। এই বিষয়টি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন – ‘ষাটের দশক থেকেই অথবা আরো কিছু আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বাংলা ছোট গল্পের গতিপ্রকৃতি পাল্টে যাচ্ছিল। গল্প আর এখন নিটোল হওয়ার জন্য ব্যস্ত নয়। ডিম ফাটিয়ে না ফেললে যেমন তার ভিতরে সারবস্তু পাওয়া যায় না ঠিক তেমনই গল্পকে ভেঙে না দিলে জীবনসত্যের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছান যাবে না।’ উপরের গল্প দুটির মত আর একটি গল্প আলোচনা করে বর্তমান আলোচনার ইতি টানবো।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ যেমন ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’ দিয়ে একটি প্রতীকের মাধ্যমে নির্ণয় করেছিলেন ‘দেশভাগ’ চিত্রটি ঠিক কেমন ছিল। অন্যদিকে শিল্পীত মনের তুলির টানে গল্পটিকে তিনি বাজিয়ে তুলেছিলেন। হাসান আজিজুল হকও দেশভাগের করাল আঘাতে অন্তর্জগত দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে যাওয়া এক বিষাক্ত মনের গল্পের বর্ণনা দিয়েছেন। গল্পটি হল ‘আত্মজা ও একটি করবীগাছ’। অবক্ষয়িত সমাজে এক বৃদ্ধের গ্লানিময় জীবনই এর বিষয়বস্তু। দেশত্যাগের সময় ব্যক্তিগত মান সম্মান বিসর্জন দিয়ে ওপার বাংলায় চলে গেছেন। দুঃখ দারিদ্রের কষাঘাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য পাড়ার বেকার যুবকদের কাছ থেকে পয়সা নেন ধার হিসেবে। হতাশাগ্রস্থ যুবকেরা বিনিময়ে গভীর রাতে সানন্দে লোলুপ আস্বাদ্ব গ্রহণ করে বৃদ্ধের কন্যা রুকুর দেহ। গভীর রাতে সানন্দে লোলুপ আস্বাদের গ্রহণ করে বৃদ্ধের কন্যা রুকুর দেহ। পাশের ঘর থেকে বৃদ্ধ শুনতে পায় কান্না ও চুড়ির আওয়াজ এবং যুবকদের আট্টহাসি। একজন পিতা তার কন্যা ওরফে আত্মজার প্রতি এই পাশবিক আচরণ করেও বাঁচতে পারেন ? হ্যাঁ বাঁচার জন্যই পারেন ? কিন্তু সে বাঁচা আর মানুষের বাঁচা নয়। এক উপায়হীন পরিস্থিতিতে অস্তিত্বের সংকটে মানুষ তার সংস্কৃতির বোধকে লুপ্ত করে দেয়। গল্পের প্রধান বিভাবকে প্রস্ফুটিত করার জন্য লেখক দেশত্যাগের পরে বৃদ্ধকে দিয়ে একটি করবী গাছ পুঁতিয়েছিলেন। সে বিপন্ন জীবনে করবী গাছ প্রধান সংকেত হয়ে ওঠে। গাছ পোঁতার কারণ হিসেবে বৃদ্ধ বলেন – ‘ফুলের জন্য নয়, বিচির জন্য – চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।’ গল্পের শেষের দিকে এই বিষাক্ত উক্তিটি লক্ষণীয়। বৃদ্ধের অভিপ্রায় ফুল নয়, বিষ উৎপাদক বিচি ! করবী ফুলের বিচি যে মারাত্মক বিষদ্গর এ কথা সত্য। কিন্তু বিষ তার অভিপ্রায় কেন ? মানুষের জীবনে সুস্থ সংস্কৃতিতে অমৃত অবস্থান করে, বিষ নয়। ফুল আমাদের জীবনে একটি সুস্থ সংস্কৃতিকে বহন করে, কিন্তু বৃদ্ধ তার মানবিক বুদ্ধিতে অনুভব করেছেন– আত্মজার শরীর বিক্রি করে যে বেঁচে থাকে তার জীবনে ফুলের আবির্ভাব অভিপ্রায় হতে পারে না। বিষই হতে পারে। আত্মজাকে নিজ হাতে অপব্যবহার করার শাস্তি বিষই হতে পারে। লেখক আজিজুল হক ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় সেই চরিত্রের মানসতাকে ছিন্নভিন্ন করেছেন। এই গল্পের মাধ্যমে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে বাংলার জনজীবন কতখানি ক্লেদ ও গ্লানিময়তার মধ্য দিয়ে গেছে। যা আজও প্রাসঙ্গিক ভাবে সত্য।

দুই বাংলার গল্পের আলোচনার মাধ্যমে বলা যেতে পারে যে, দেশভাগের পুবর্বতী সময়ে মানুষ অনুভব করেছিল তাদের সামনে ভয়ঙ্কর একটি কঠিন সময় উপস্থিত হচ্ছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সমাধানের পথ বের করায় তাদের সামনে নানারকম অন্তরায় ছিল। দেশভাগের অনতিপরের গল্পগুলিতে আর এমনটি ঘটেনি। তারা অনুভব করেছে যে তাদের প্রধান সমস্যাটা কি। ফলে গল্পেরও রূপান্তর ঘটেছে। এই বিভাগ যখন হয়েই গেছে এবং তার পর মানুষ বেশ কিছুটা সময় অতিক্রম করে ফেলেছে, তখন বাংলা গল্প বহির্জগৎ ছেড়ে অন্তর্জগতের দিকে ধাবিত হয়ে শিল্পসুষমামণ্ডিতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সহায়ক গ্রন্থ –

১। ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’, পরিশিষ্ট, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ-

৬২৮।

২। ‘যে বাঁচায়’, অন্নদাশঙ্কর রায়, ‘ভেদ-বিভেদ’ : সম্পাদনা – মানবেন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ – ১০২।

৩। ‘দেশভাগ, বাংলা কথাসাহিত্যের দর্পণে’ – সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। ‘কালান্তরের গল্প ও গল্পের কালান্তর’, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাচিত গল্প

সংকলন, সম্পাদনা, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, দে’জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯১,

পৃঃ-৮-৯।

রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ : একটি ভিন্নপাঠ

ড. বিভাবসু দত্ত

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়

কোনো কোনো সৃষ্টি থাকে সময় যাদের স্পর্শ করতে পারে না, সময়ের ধুলো জমে না এদের গায়ে, চির নতুন থেকে যায় এই সব সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ (১৯১২) তো এরকমই এক সৃষ্টি। একশো বছর পরেও মনে হয় যেন এই মাত্র লেখা হল নাটকটি। ‘ডাকঘর’ হোল এমনই একটি নাটক যা ভেঙে দিয়েছে দেশ-কালের গন্ডি। ‘ডাকঘরের’ ঘটনাটি কেবলমাত্র বাংলাদেশের মধ্যেই সিমাবদ্ধ, তা কিন্তু নয়-পৃথিবির যে কোন দেশের ঘটনা এটি; এর মধ্যে যে মানবিক রস আছে পৃথিবীর সকলদেশেই তা স্রোতস্বিনী নদীর মতো বহমান।

স্থিতি আর গতির নাটক হল ‘ডাকঘর’। অমলকে ঘিরেই আবর্তিত সমস্ত ‘ডাকঘর’ নাটকটি। নাটকটিতে অমলের প্রেক্ষনবিন্দুর কোন স্থানান্তরণ ঘটে না। এই নাটকের মৌল বিষয়টি হল অমলের বসে থাকা আর সকলের চলাচল। রোগ জর্জর, প্রায় অর্থব অমল বসে থাকে আর তাকে ঘিরে রাখে জীবনের বিপুল তরঙ্গ। অমলের ইচ্ছে করে- ‘আমাদের জানালার কাছে বসে সেই - যে দূরে পাহাড় দেখা যায় - আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই’। পিসেমশায় বুঝতে পারেনা অমলের কথা। আসলে অমল এবং পিসেমশায়ের প্রেক্ষণবিন্দু দুটি ভিন্ন, অমল যেখানে বিনা কাজে ঘুরতে চেয়েছে সেখানে পিসেমশায় কর্মহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার একেবারেই বিপক্ষে। তাই অমলের কথার প্রতিবাদ করে বলেন- ‘কী পাগলের মোত কথা! কাজ নেই, কর্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই! কী যে বলে তাঁর ঠিক নেই। পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মত উঁচু আছে তখন তো বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ- নইলে এত বড়ো বড়ো পাথর জড়ো করে এত বড়ো একটা করার কী দরকার ছিল!’ অমলের কিন্তু এর উল্টোটাই মনে হয়েছে -“পিসেমশায়, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করছে? আমার ঠিক বোধহয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারেনা, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানালার ধারে বসে ঐ ডাক শুনতে পায়।’

অমল ঘরে বসেই দেখে কাজ খুঁজতে যাওয়া মানুষোটিকে; অমল তাঁর পিসেমশায়কে সেই মানুষটির কথা বলে, “তাঁর কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটুলি বাঁধা। তাঁর বা হাতে একটা ঘটি। পুরানো এক জোড়া নাগরা জুতো পরে সে এই মাঠের পথ দিয়ে ওই পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল। আমি তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললে, কী জানি, যেখানে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন যাচ্ছ? সে বললে কাজ খুঁজতে যাচ্ছি। ... তারপরে সেই নাগড়া জুতো পরা লোকটা চলে গেল- আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। সেই যেখানে ডুমুর গাছের তলা দিয়ে ঝরণা বয়ে যাচ্ছে, সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরণার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে- তারপরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিলে- পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝরণার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল। পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরণার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।’ এই কাজ খুঁজতে যাওয়া লোকটিকে অমলেরও অনির্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে জাগে- ‘কত বাঁকা বাঁকা ঝরণার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব- দুপুরবেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কত দূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।’

অমলের বাড়ির সামনে দিয়ে দইওয়ালা দই বিক্রি করতে করতে চলে যায়, বসে থাকা অমল অস্থির হয়ে ওঠে - অমলের ইচ্ছে করে দইওয়ালার সঙ্গে চলে যেতে- ‘আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।’ অমলের বাসনা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দই বিক্রি করার; তাই দইওয়ালা যখন বলেছে- ‘মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা? এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পন্ডিত হয়ে উঠবে। তখন একথার প্রবল আপত্তি করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে দই বিক্রির ইচ্ছের কথা জানিয়েছে অমল-‘না, না আমি ককখনো পন্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙ্গা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই-ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও’।

পথ দিয়ে প্রহরী যায়, তাকেও অমল ডাকতে থাকে। প্রহরী ধরে নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়- একেবারে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়। অমল একথায় ভয় পায়না বরং আরো বেশী উৎসাহিত সাহিত হয় কিন্তু পরমুহুর্তেই মনে পড়ে তাঁর কোথাও যাওয়া হবে না, এই ঘরের মধ্যেই থাকতে হবে, একটা হাহতাস, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঝরে পড়ে অমলের কথায়- ‘রাজার কাছে? নিয়ে যাও-না আমাকে। কিন্তু আমাকে যে কবিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোথাও ধরে নিয়ে যেতে পারবে না- আমাকে কেবল দিনরাত্রি এখানেই বসে থাকতে হবে”। অমলের এই বেদনামথিত উচ্চারণ আমাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে।

প্রহরী ঘন্টা বাজায়; ‘ঘন্টা কেন বাজে?’- অমলের এই প্রশ্নের জবাবে প্রহরী যা বলে সেখানে আমরা পাই গতির কথা, প্রহরী বলে, ‘ঘন্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে?’ কৌতুহলী বালকের স্বাভাবিক প্রশ্ন-‘কোথায় চলে যাচ্ছে? কোন দেশে’? প্রহরী তাঁর জবাবে জানিয়েছে- ‘সে কথা কেউ জানে না।’ অমলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে ‘সময়’- অমল তো স্থবীর হয়ে গেছে আর সময় চলছে। তাই অমলের ইচ্ছে করে সময়ের দেশে যেতে- ‘আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই- যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দুরে।’ সময় এগিয়ে যায় কোথাও থেমে থাকে না, কাল থেকে কালান্তরের দিকে চলে যায় সময়-একে স্তব্ধ করার ক্ষমতা কারও নেই, এমনকি ফিরিয়ে আনার ক্ষমতাও নেই কারো। অমলের এই ভাবে বসে থকতে ভালো লাগে না। অমল তো বসে থাকে-অমলের এইবসে থাকতে যে ভালো লাগে না, সেই কথাই অমল আর প্রহরীর কথোপকথনে ফুটে উঠেছে-

অমল। কিন্তু কবিরাজ যে আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে।

প্রহরী। কোনদিন কবিরাজই হয়তো স্বয়ং হাতে ধরে নিয়ে যাবেন !

অমল। না না, তুমি তাঁকে জান না, সে কেবলই হাত ধরে রেখে দেয়।

প্রহরী। তার চেয়ে ভালো কবিরাজ যিনি আছেন, তিনি এসে ছেড়ে দিয়ে যান।

অমল। আমার সেই ভালো কবিরাজ কবে আসবেন? আমার যে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না।’ অমলের বসে থাকা আর সময়ের এগিয়ে যাওয়া- এক বিপ্রতীপ চিত্রের নক্সা সৃষ্টি হয়েছে এখানে।

‘সময়’ থেকে অমলের দৃষ্টি সরে যায় অন্যদিকে- অমলের দৃষ্টি পড়ে এক বড় বাড়ির দিকে, যেখানে কর্মব্যস্ত মানুষের মেলা। অনন্ত কৌতুহলী বালক অমল এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রহরীকে- ‘আচ্ছা, ঐ যে রাস্তার ওপারের বড়ো বাড়িতে নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে, আর ওখানে সব লোকজন কেবলই আসছে যাচ্ছে- ওখানে কী হয়েছে?’ প্রহরী জবাবে জানায়- ‘ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে’। ডাকঘর মানেই চলাচল-গতি। অমলের গতিহীন ভাবে বসে থাকা। প্রহরী ঠাট্টার ছলে অমলের মধ্যে রাজার কাজ থেকে ছিঠি আসার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে -

‘অমল। ডাকঘর? কার ডাকঘর?

প্রহরী। ডাকঘর আর কার হবে? রাজার ডাক ঘর। – এ ছেলেটি ভারি

মজার।

অমল। রাজার ডাক ঘরে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে?

প্রহরী। আসে বইকি। দেখো, একদিন তোমার নামেও চিঠি আসবে।

অমল। আমার নামেও চিঠি আসবে? আমি যে ছেলে মানুষ।

প্রহরী। ছেলে মানুষকে রাজা এতটুকু টুকু- ছোট্ট ছোট্ট চিঠি লেখেন।

অমল। বেশ হবে। আমি কবে চিঠি পাব? আমাকেও তিনি চিঠি লিখবেন তুমি কেমন করে জানলে?

প্রহরী। তা নইলে তিনি ঠিক তোমার এই খোলা জানালাটার সামনেই অত বড় একটা সোনালী রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খুলতে যাবেন কেন? ছেলেটাকে আমার বেশ লাগছে।’

ডাকঘরের কাজই হল জনসংযোগ করা- বার্তা বহন করা। ডাক- হরকরাদের কাজই হলঘরে ঘরে বার্তা পৌঁছে দেওয়া। অমলের ইচ্ছে করে ডাক-হরকরা হওয়ার, কারণ ডাক-হরকরা হতে পারলে ঘুরতে পারবে। প্রহরী ও অমলের কথোপকথনের মধ্যেই অমলের এই অভিপ্সাটি প্রকাশিত হয়েছে।

অমল। আচ্ছা, রাজার কাছ থেকে আমার চিঠি এলে আমাকে কে এনে

দেবে?

প্রহরী। রাজার যে অনেক ডাক হরকরা আছে- দেখনি বুকে গোল গোল

সোনার তকমা পড়ে তারা ঘুরে বেড়ায়।

অমল। আচ্ছা, কোথায় তারা ঘোরে?

প্রহরী। ঘরে ঘরে, দেশে দেশে। – এর প্রশন শুনলে হাসি পায়।

অমল। বড়ো হলে আমি রাজার ডাক হরকরা হব।

প্রহরী। হা হা হা হা। ডাকহরকরা ! সে ভারি মস্ত কাজ। রোদ নেই বৃষ্টি নেই, গরিব নেই বড়ো মানুষ নেই, সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়ানো- সে খুব জবর কাজ!’

অমল যখন ঘরে বসে বসে বড় হয়ে ডাক হরকরা হওয়ার স্বপ্ন দেখে তখন দেখতে পায় পথ দিয়ে কে চলে যায়, অমল বলে- ‘কে তুমি মল ঝমঝম করতে করতে চলেছ- একটু দাঁড়াওনা ভাই’। বালিকাটি জবাব দেয়- ‘আমার কি দাঁড়াবার জো আছে। বেলা বয়ে যায় যে।’ শশীমালিনীর মেয়ে সুধা চলেছে ফুল তুলতে। সুধার মধ্যেও সেই গতি-তার থামার উপায় নেই। অমল যে স্থিতির অবস্থায় আছে সেটা অমলের খুবই অপছন্দ; সে চায় গতি। সুধাকে অমল সে কথাটাই বড় বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করেছে- ‘তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না- আমারও এখানে আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না।’ অমল সুধাকে বলে ‘আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম তাহলে উচু ডালে যেখানে দেখা যায়না সেই খান থেকে আমি তোমাকে ফুল পেড়ে দিতুম।’ সুধার কিন্তু এই স্থিতিটা সাময়ীকভাবে বেশ পছন্দ, আনন্দের। সে উপভোগ করতে চায় বসে থাকা। এ এক আশ্চর্য সমাপতন। একজন গতির জন্য ছটফট করছে আর একজন স্থিতি কামনা করছে। সুধা বলেছে অমলকে, ‘আমি যদি তোমার মতো এইখানে বসে থাকতে পারতুম তা হলে কেমন মজা হত!’

চলচ্চিত্রের মতো অমলের চোখের সামনে দিয়ে একটার পর একটা ছবি চলে যায়। সুধার পর আসে ছেলের দল। অমলের খোলা জানালার সামনের রাস্তা দিয়ে ছেলের দল খেলতে যায়। বসে থাকা অমল ছেলের দলকে ডাক দেয়-‘ভাই, তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ ভাই? একবার একটুখানি এইখনে দাঁড়াও না।’ এখানেও সেই স্থিতি গতির দ্বন্ধ। ছেলেরা অমলকে ডাক দেয়- ‘তুমি বেরিয়ে এসো-না, খেলবে চলো।’ অমলের বেরনোর উপায় নেই, তাকে ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে, তাই ছেলের দলকে অমল বিষন্ন সুরে জানায়- ‘কবিরাজ আমাকে বেরিয়ে যেতে মানা করেছে।’ কিন্তু ছেলের দলের এখন গতির নেশা তাই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করতে চায়না, তাই ছেলেরা বলে- ‘কবিরাজ! কবিরাজের মানা তুমি শোন বুঝি! চল ভাই চল আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।’ অমলের বসে থাকতে থাকতে ক্লান্তি লাগে, ঘুম পায়। ছেলের দলকে নিজের সমস্ত খেলনা দিয়ে তারজানালার সামনে খেলা দেখতে বলে অমল। বাইরের প্রাণময়তা সে অনুভব করতে চায়, কিন্তু তাঁর দুর্বল শরীর বেশীক্ষণ বসিয়ে রাখতে পারে না। ছেলের দল যখন বলে- ‘কিন্তু ভাই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ছ!’ অমল বলে- ‘হাঁ, আমার ভারি ঘুম পেয়ে আসছে। জানিনে কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি, আর বসে থাকতে পারছি নে- আমার পিঠ ব্যথা করছে।’

সমস্ত ‘ডাকঘর’ নাটক জুড়েই চলে স্থিতি আর গতির দ্বন্দ্ব। অমলের বসে থাকা আর সবার চলাচল। অমল আর ঠাকুরদা স্থাবর আর জঙ্গম জীবনের প্রতীক। স্থাবর আর জঙ্গম জীবন নিয়ে ‘ডাকঘর’ নাটকে তৈরী হয়েছে এক আশ্চর্য নক্সা। ঠাকুরদা মানেই গতি। চিরনবীন ঠাকুরদা অন্তহীন চলা-কোথাও থামা নেই। জীর্ণজরা ঝরিয়ে ফেলে সর্বদাই নতুনের সন্ধান করে ফেরেন ঠাকুরদা। বড় সজীব এই ঠাকুরদা-বয়স তাঁকে ছুঁতে পারে না, জরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, সবাই তাঁর বন্ধু। ছোটদের সঙ্গে ঠাকুরদার সবচেয়ে ঘনিষ্ট সম্পর্ক, মাধব দত্ত ঠাকুরদাকে বলেছে- ‘তুমি যে ছেলে খেপাবার সর্দার।’... ‘ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়ো বয়সের খেলা-তাই তোমাকে ভয় করি।’ ‘ডাকঘর’ নাটকে ফকিরের ছদ্মবেশে ঠাকুরদা অমলের কাছে আসেন। তিনি অমলের মন–সহচর। ঠাকুরদা অমলকে শোনায় নানা জায়গার ভ্রমণবৃত্তান্ত। ঠাকুরদা ক্রৌঞ্চদ্বীপের গল্প বলে একটা ফ্যান্টাসির জগত সৃষ্টি করেন, শিশুদের ইচ্ছা পূরণের গল্প নির্মাণ করেন। অমল শারীরিকভাবে বসে থাকলেও কল্পনার পাখা মেলতে তাঁর জুড়ি নেই তাই অমল ঠাকুরদার সঙ্গে বেরিয়েছে মানস ভ্রমনে। ঠাকুরদা যেহেতু স্বপ্নিল জগতে ঘুরে বেড়ান সেহেতু কোথাও তাঁর হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা- সর্বত্রই তিনি যেতে পারেন। অমল যখন জিজ্ঞান্সা করে- ‘এবার তুমি কোথায় গিয়েছিলে ফকির?’ তার উত্তরে ঠাকুরদা বলেন- আমি ক্রৌঞ্চদ্বীপ গিয়েছিলুম, সেইখান থেকেই এই মাত্র আসছি।’ পিসেমশায় আশ্চর্য হয়ে বলে; ‘ক্রৌঞ্চদ্বীপে?’ ঠাকুরদা গতিশীল মানুষ, তাঁর মন ঘুরে বেড়ায় দূরে দূরে – এ এক আশ্চর্য ভ্রমণ। ঠাকুরদা নিজেই মাধব দত্তকে বলেন- ‘এতে আশ্চর্য হও কেন? তোমাদের মতো আমাকে পেয়েছ? আমার তো যেতে কোন খরচ নেই। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি।’ অমল এই ভ্রমণের সঙ্গী হতে চায়, তাই ঠাকুরদাকে বলেন- ‘তোমার ভারী মজা। আমি যখন ভালো হব তখন তুমি আমাকে চেলা করে নেবে বলেছিলে, মনে আছে ফকির?’ ঠাকুরদা বলেন- ‘খুব মনে আছে। বেড়াবার এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে দেব যে সমুদ্রে পাহাড়ে অরণ্যে কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না।’ স্থবির জীবন অমলের ভালো লাগে না, অমল গতি চায়, তাই সুস্থ হলেই সে বেরিয়ে পড়তে চায়। পিসেমশায়কে অমল বলে- ‘না না পিসেমশায়, তুমি কবিরাজকে কিছু বল না।– এখন আমি এই খানে শুয়ে থাকব, কিচ্ছু করবো না- কিন্তু যেদিন আমি ভালো হব সেই দিনই আমি ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে যাব-নদী পাহাড় সমুদ্রে আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না।’

অমল রাজার চিঠির অপেক্ষায় থাকে; ঠাকুরদাকে জিজ্ঞেস করে- ‘এইবার আমাকে চুপিচুপি বলো-না ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে।’ ঠাকুরদা তাঁর জবাবে জানিয়েছে- ‘শুনেছি তো তোর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে চিঠি এখন পথে আছে।’ অমলের চোখের সামনে সেই পথের ছবিটি ভেসে ওঠে - ‘পথে? কোন পথে? সেই যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেলে অনেক দূর দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে?’ পথ মানেই গতি, পথ মানেই চলা। অমল মানস চক্ষে সেই চলার ছবি দেখে, ঠাকুরদাকে ডাকহরকরার সেই চলার বর্ণনা শোনায়- ‘আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই-মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি-সে অনেকদিন আগে-কত দিন তা মনে পড়েনা। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে-বাঁ হাতে তাঁর লন্ঠন, কাঁধে তাঁর চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে চলে আসছে-নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে সে কেবল আসছে-তারপরে আখের খেত-সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে-রাত দিন একলাটি চলে আসছে; খেতের মধ্যে ঝি ঝি পোকা ডাকছে-নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদা খোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে-আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতর ভারি খুশি হয়ে উঠছে।’

অমলকে ডাকঘর টানে- যে রাজার ডাকঘর তাঁর বিষয়ে খবর করে ঠাকুরদার কাছে- ‘আচ্ছা ফকির, যার ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জান?’ ঠাকুরদা রাজাকে জানে, রাজার কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যায়। অমল সুস্থ হয়ে উঠলে রাজার কাছে ভিক্ষা নিতে যাবে। অমল রাজার কাছে কোণ ধন-দৌলত বা কোণ পার্থিব সম্পদ চায়না, সে চায় রাজার ডাক হরকরা হতে। ডাক হরকরা হয়ে লন্ঠন হাতে ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়াবে অমল- ‘আমি বলব, আমাকে তোমার ডাক হরকরা করে দাও, আমি অমনি লন্ঠন হা্তে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াব।’ এই বিচিত্র চাওয়া তো অমলের পক্ষেই সম্ভব। অমল জীবনের গতি চায় কিন্তু অসুস্থ শরীর তাঁকে স্থবির করে দিয়েছে। গতি চায় বলেই সে রাজার ডাকহরকরা হতে চেয়েছে।

ডাকঘরের সূচনাতেই দেখি অমল অসুস্থ-বুকে কফ জমে আছে, শরীর দুর্বল। অমলের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও দেখি স্থিতি আর গতির দ্বন্ধ। বিষয়টি একটু স্পষ্ট করা দরকার। অমলের স্থানীয় চিকিৎসকটি স্থিতিরই প্রতীক। তিনি অমলকে বসিয়ে রাখতে চান আর এর বিপ্রতীপে আছে রাজকবিরাজ। তিনি গতির প্রতীক-তিনি অমলকে বসিয়ে রাখার বিপক্ষে, তিনি অমলকে ছেড়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে সূক্ষ্মভাবে চিকিৎসা সঙ্কট তুলে ধরেছেন। রোগীর বাড়ির লোকেদের চিকিৎসকের উপর অন্ধভাবে নির্ভরশীল হতে হয়-সে চিকিৎসা ঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে; পরিজনেরা একেবারে অসহায়। ডাকঘর নাটকে অমলের পিসেমশায় মাধবদত্তও অমলের চিকিৎসার ব্যাপারে স্থানীয় কবিরাজের উপর নির্ভরশীল। কবিরাজ অমলকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দেন, তিনি বলেন- ‘আমি তো পূর্বেই বলেছি, ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।’ মাধব দত্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে, কবিরাজকে বলে- ‘ছেলে মানুষ, ওকে দিন রাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা ভারি শক্ত।’ কবিরাজ তাঁর জবাবে শাস্ত্রবাক্য শুনিয়ে দেন- ‘তা কি করবেন বলেন। এই শরৎ কালের রৌদ্র আর বায়ু দুই ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ-কারণ কিনা শাস্ত্রে বলছে, অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং হলীমকে।’ এই কবিরাজের চিকিৎসা রোগীকে গতিহীন,স্থ বির করে দেয়। একেবারেই স্থিতির কথা বলেন এই স্থানীয় কবিরাজ, অমলকে স্থানু করে দেন। যে কবিরাজ অমলের চিকিৎসা করেন তিনি চিকিৎসা থেকে শাস্ত্রচর্চাই বেশী করেন আবার ভাগ্যের কথা বলেন। অমলের পিসেমশায় মাধব দত্তকে বলেন- ‘ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে, তাহলে দীর্ঘকাল বাঁচতেও পারে, কিন্তু আয়ুর্বেদ যেরকম লিখছে তাতে তো ...।’ চিকিৎসা বিজ্ঞান যদি ফলিত বিজ্ঞান না হয়ে শাস্ত্রবচনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তাঁর পরিণতি যে কী ভয়ঙ্কর তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই স্থানীয় কবিরাজ। কবিরাজি চিকিৎসা তিনি কত টুকু জানেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই কবিরাজ অমলের রোগ নির্ণয় করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কবিরাজ অমলের ভুল চিকিৎসা করেছে। অমলকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। দরজা জানালা সব বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে বাইরের হাওয়া না লেগে অমলের অসুখ বাড়ে। মাধব দত্তের সঙ্গে কবিরাজের কথোপকথনে সেই কথাই ফুটে উঠেছে-

মাধব দত্ত। দোহাই কবিরাজ মশায়, চক্রধর দত্তের কথা রেখে দিন। এখন বলুন ব্যাপার খানা কি।

কবিরাজ। বোধ হচ্ছে, আর ধরে রাখা যাবে না। আমি তো নিষেধ করে গিয়েছিলুম কিন্তু বোধ হচ্ছে বাইরের হাওয়া লেগেছে।

মাধব দত্ত। না কবিরাজ মশায়, আমি ওকে খুব করেই আগলে সামনে রেখেছি। ওকে বাইরে যেতে দেইনি-দরজা তো প্রায়ই বন্ধ রাখি।

কবিরাজ। হঠাৎ আজ একটা কেমন হাওয়া দিয়েছে-আমি দেখে এলুম, তোমাদের সদর-দরজার ভিতর দিয়ে হুহু করে হাওয়া বইছে। ওটা একেবারেই ভাল নয়। ও দরজাটা বেশ ভালো করে তালা চাবি বন্ধ করে দাও। না হয় দিন দুই তিন তোমাদের এখানে লোক আনাগোনা বন্ধই থাক-না। যদি কেউ এসে পড়ে খিড়কি-দরজা আছে। ঐ যে জানালা দিয়ে সুর্যাস্তের আভাটা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড় জাগিয়ে রেখে দেয়।’

কবিরাজের এই নিদানের ফলে অমলের শারীরিক স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হবে না; বরং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হবে নিশ্চিতভাবেই। এই কবিরাজ মানুষকে সুস্থ করার চেষ্টার পরিবর্তে ভয় দেখায়। কবিরাজকে আমাদের পছন্দ হয় না। এই নাটকে কবিরাজ জীবনের বিপরিতে দাঁড়িয়ে আছে-সমস্ত ব্যাপারে তাঁর নিষেধাজ্ঞা। আমাদের নঞর্থকতার, স্থবিরতার দিকে নিয়ে যায় এই কবিরাজ। ডাকঘর নাটকটিকে এই অন্ধকার দিক থেকে আলোর দিকে ফেরায় রাজকবিরাজ, একটা সদর্থকতার দিকে নিয়ে যান তিনি। রাজকবিরাজ তো গতির ই প্রতীক। স্থানীয় কবিরাজের একেবারে বিপরীত চিকিৎসা শুরু করেন রাজকবিরাজ। চিকিৎসার সূচনাতেই তিনি অমলের বন্ধ জানালা খুলে দিয়ে বাইরের প্রকৃতির আলো, টাটকা বাতাস ঘরে ঢুকতে দেয়। রাজ কবিরাজের চিকিৎসায় অমল মুক্তি পায়। অমলের ঘরে ঢুকেই রাজ কবিরাজের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এবং তাঁর নির্দেশ আমরা লক্ষ্য করব। প্রাসঙ্গিক ভাবে অমলের সঙ্গে রাজকবিরাজের কথোপকথনটি উদ্ধার করবো-

রাজকবিরাজ। একি! চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার জানালা আছে সব খুলে দাও।–(অমলের গাঁয়ে হাত দিয়া) বাবা, কেমন বোধ করছ?

অমল। খুব ভালো, খুব ভালো কবিরাজ মশায়। আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোনো বেদনা নেই। আঃ সব খুলে দিয়েছে- সব তারা গুলি দেখতে পাচ্ছি- অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।

রাজকবিরাজ। অর্ধ রাত্রে যখন রাজা আসবেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বেরোতে পারবে?

অমল। পারব, আমি পারব, বেরোতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব, এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটি দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধহয় কতবার দেখেছি কিন্তু সে যে কোনটা সে তো আমি চিনিনে।

রাজকবিরাজ। তিনি সব চিনিয়ে দেবেন। (মাধবের প্রতি) এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্য পরিস্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখো। (মোড়লকে নির্দেশ করিয়া) ঐ লোকটিকে তো এ ঘরে রাখা চলবে না’।

এতদিন যে অমলের ভুল চিকিৎসা হচ্ছিল তা বুঝতে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। রাজকবিরাজের সান্নিধ্যে অমল শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। রাজকবিরাজ বলেছেন-‘কোনো দরকার নেই। এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এল, এল ওর ঘুম এল। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব-ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিভিয়ে দাও-এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম আসছে।’ অমলের এই ঘুমকে সমালোচকেরা মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেন। আমরা কিন্তু একথা মেনে নিতে পারিনা। অমলের এই ঘুম সাময়ীক ঘুম-চির নিদ্রা নয়। রাজকবিরাজ সে বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন। অমল যে জেগে উঠবে সে কথা রাজকবিরাজ সুধার জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছেন। অমল কখন জেগে উঠবে সুধা জিজ্ঞাসা করলে রাজকবিরাজ জানিয়েছেন- ‘এখনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।’ আমাদের ভাবতে ভালো লাগে রাজা আসলে অমল জেগে উঠবে-রাজার হাত ধরে বাইরে বেড়িয়ে পড়বে। ডাকঘর নাটকের যে মানবিক রস আছে, যে হৃদয়ের সুর শুনি তা চিরকালীন হয়ে যায়। সুধা আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে চিরকাল। সুধা তো এখানে আমাদের মূল্যবোধের প্রতীক-যে মূল্যবোধটা নিশ্চিত ভাবেই শাশ্বত। মানবতাবাদের দৃষ্টিকোন থেকে সমগ্র মানবসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে ডাকঘর নাটকের সুধা চরিত্রটি। আমদের স্মৃতিতে অমলিন থেকে যায় এই নাটকে সুধার বচনটি -

সুধা। অমল

রাজকবিরাজ। ও ঘুমিয়ে পড়েছে। সুধা। আমি যে ওর জন্য ফুল এনেছি- ওর হাতে কি দিতে পারবো না?

রাজকবিরাজ। আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

সুধা। ও কখন জাগবে?

রাজকবিরাজ। এখনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।

সুধা। তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে?

রাজকবিরাজ। কি বলব?

সুধা। বোলো যে, ‘সুধা তোমাকে ভোলে নি।’

সময়কে অতিক্রম করে সুধা চরিত্রটি চিরকালীন হয়ে গেল। ‘সুধা তোমাকে ভোলে নি’- কথাটি যেন রবীন্দ্র সাহিত্যে ধ্রুবপদ হয়ে আছে।

সুধীন দত্তের ‘উঠপাখী’ অথবা প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থের সাধনা

ড. আকাশ বিশ্বাস

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?

কাকু বক্রোক্তি’র নিদারুণ আর্তনাদে শুরু হয়েছিল ‘ক্রন্দসী’ কাব্যগ্রন্থের ‘উঠপাখী’ কবিতাটি। শিরোনাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে উঠপাখিকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলি বলছেন কবি। এবং তাঁর কথা যে উদ্দিষ্ট পাখিটি শুনতে পাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে দ্বিতীয় পঙ্ ক্তিতে এসেই :

কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?

কোথায় লুকাবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;

ক্ষ’য়ে ক্ষ’য়ে ছায়া ম’রে গেছে পদতলে।

‘‘ উটপাখির পক্ষে এই ধরনের ব্যবহার স্বাভাবিক –কিন্তু এই কবিতায় সে তো শুধু উটপাখি নয় ,সে মানবভাগ্যের সঙ্গে জড়িত । সুতরাং উটপাখির মুখ গুঁজে থাকার পিছনে কোন গূঢ়ার্থ আছে । বস্তুত অনুশোচনা , নিরাশ্রয় বর্তমান ও আগ্রাসী আগামীর ভয়েই সে আত্মপ্রবঞ্চনার পথ বেছে নিয়েছে। …চর্তুদিকে মরুভূমি, ছায়াও ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরে গেছে ,যে ছায়া অস্তিত্বের প্রতীক ও প্রমাণ। সুতরাং উটপাখিকে কবির দ্বিতীয় প্রশ্ন,কোথায় লুকোবে?’’ ১

আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ;

নির্বাক , নীল , নির্মম মহাকাশ ।

নিষাদের মন মায়ামৃগে ম’জে নেই ;

তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ ।

সুধীন্দ্রনাথ ‘উটপাখী’ কবিতাটা লিখেছেন ২২শে অক্টোবর ১৯৩৪-এ। সমালোচকের কথামতো :‘কবির ব্যক্তিগত চয়নের …একান্ত ক্ষেত্রটি, …রূপান্তরিত হয়ে গেল ‘ক্রন্দসী’তে। গোটা পৃথিবী জুড়ে দুই হাতে কালের মন্দিরা তখন বড় বেসুরো ভাবে বাজছে,ডাইনে বাঁয়ে। ভার্সাই চুক্তিকে পাত্তা না দিয়ে জাপান আক্রমণ করলো মাঞ্চুরিয়া (১৯৩১)। অন্য সব রাষ্ট্রীয় পক্ষকে অন্ধকারে রেখে ১৯৩৫য়ে অ্যাংলো-জার্মান নৌচুক্তি সম্পাদিত হল। একই বছর ১৯৩৫ য়ের অক্টোবর মুসোলিনির ইতালি বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করে বসলো ইথিওপিয়া। ‘লীগ অব নেশন্ স’য়ের কর্তারা চুপচাপ দেখে গেলেন এই বর্বরতা। ‘ক্রন্দসী’র অধিকাংশ কবিতা এই বহ্নিমান সময়ে রচিত হয়েছিল।

‘ক্রন্দসী’র কবি দারুণ প্রশ্নাতুর , ব্যহতবাসনা অস্তিত্ব আর আস্তিক্য নিয়ে শব্দে শব্দে অস্থির যেন-- ...প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর শ্মশানশান্তিও ততোদিনে শেষ। জার্মানী আর ফ্রান্সের দুই বিদেশমন্ত্রী স্ট্রেসেমান এবং ব্রিয়াঁর শান্তিদৌত্যেরও ইতি। ইতিহাসের কানাগলি থেকে রাজপথ পর্যন্ত ভাবী নাৎসি সন্ত্রাসের এই ঊষর পটভূমিতে ‘ক্রন্দসী’র প্রথম কবিতা ‘উটপাখী’ একটি পৃথক দৃষ্টিকোণ এবং প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পায়...’।২

এবং এই কথা পড়ার পর ‘উটপাখী’ কবিতার এই একান্ত স্বাভাবিক অকরূণ প্রকৃতি আর মরীচিকাহীন দিগন্তের ব্যাখ্যা হিসেবে অতন্ত সঙ্গত মনে হয় দেবতোষ বসু’র কথা ; এহেন প্রাকৃতিক প্রেক্ষিত ‘‘মিথ্যা প্রলোভনও অসম্ভব’’৩ যেখানে । নির্বাক ,নীল মহাকাশও দেয় না আত্মগোপনের জন্য কোনো উপযুক্ত আকাশ। শিকারীর পক্ষেও এই মরীচিকাহীন দিগন্তে মৃগয়া-মজায় মজে থাকার জো নেই ,আর তাই বোধহয় সুধীন্দ্রনাথ অতঃপর বলেন :

কোথায় পালাবে ? ছুটবে বা আর কত?

উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।

প্রাক্ পুরানিক বাল্যবন্ধু যত

বিগত সবাই,তুমি অসহায় একা।।

মরুবালুও উদাসীন। কোনো হেল-দোল নেই তার শরীরেও। পলায়নের পদচিহ্ন মুছে দিতে তার বয়েই গেছে। তার বাল্যবন্ধুরাও এতদিনে সবাই বিগত। ‘প্রাক্ পুরাণিক’ এই শব্দের দ্বারা আমরা উটপাখির প্রাচীনত্বের বিষয় জানতে পারলুম, কিন্তু এই শব্দটি শুধু প্রাচীনতারই ইংগিতবহ এমন মেনে নিতে আমাদের মন সায় দেয় না। ‘পুরাণ’ কথাটি এখানে এলো কেন ?এই কবিতার ইংরেজী অনুবাদে ( Monroe সম্পাদিত Poetry পত্রিকায় ১৯৫৯ সালে Camel bird নামে প্রকাশিত) সুধীন্দ্রনাথ ‘prehistoric’শব্দটি ব্যবহার করেছেন—সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে এখানে পুরাণের সঙ্গে mythology-র কোনো সম্পর্ক নেই। প্রাক্ পুরাণিক কি তাহলে প্রাগৈতিহাসিক ? যদি হয় তবে সুধীন্দ্রনাথ প্রাগৈতিহাসিক ব্যবহার করলেন না কেন? অবশ্যই তাতে ছন্দপতন হতো। কিন্তু … ‘প্রাক্ পুরাণিক’ ও ‘প্রাগৈতিহাসিক’ এই দুটি শব্দের অভিন্নতা এইখানে যে উভয়েই কালদ্যোতক,কিন্তু ‘প্রাক্ পুরাণিক’-এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু কথা আছে… ‘উটপাখি প্রাক্ পুরাণিক’ এই বাক্যের মধ্যে যে শুধু কালগত নয় গুণগত তাৎপর্যও আছে তা আমরা যথাসময়ে দেখতে পাবো।’৪ কিন্তু এতক্ষণে সবমিলিয়ে সুধীন্দ্রনাথ রচনা করে ফেলেছেন এক ঊষর ,বালুকাময় খিলভূমির। জীবন সেখানে এখনও পর্যন্ত আছে—এই যা! কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে নব-সৃষ্টির সব সম্ভাব্য সঙ্গীত থেমে যেতে পারে চিরকালের মতো। আমাদের মনে পড়তে পারে এলিয়টের ‘ Waste-Land’-এর কথা। আমাদের মনে পড়তে পারে বাংলা আধুনিক কবিতার জন্মের ইতিহাস, ‘যদিও বোদলেয়ার থেকে পশ্চিমে আধুনিক কবিতার সূত্রপাত মনে করেন অনেকে ,তবু প্রথম মহাযুদ্ধের পরই ইউরোপের পোড়ো জমিতে আধুনিক কবিতার জন্ম,আর মূলত তারই প্রভাবে গড়ে ওঠে বাংলা কবিতার ধারা।’৫ সময়ের বন্ধাত্ব,প্রাণহীনতা প্রতিভাত হবে সেই সময়ের কবিতায় সেটা একান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু সে যাই হোক,আমরা বরং ফিরে আসি কবিতায়। মূলত ‘তিনটি প্রশ্নের দ্বারা উটপাখির পরিত্রাণের আশাকে চুরমার করে দিয়ে কবি দ্বিতীয় স্তবকে অন্য এক সমতলে এসে দাঁড়ালেন’৬। একটি প্রশ্ন করলেন আবার :

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?

এবং নিজেই জানালেন :

মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।

অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ?

কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া ।

দেবতোষ বসু বলছেন, ‘এই স্তবকে ঊটপাখি তার আত্মপ্রবঞ্চনার স্বভাব নিয়ে মাতৃমূর্তিতে দেখা দিল। একটি প্রশ্নের মধ্যে কবি তাকে জানিয়ে দিলেন যে,তা দিলেও ফাটা ডিমে জোড়া লাগবে না। ... কবিতাটিতে ‘তা’ বা তাপের পাশাপাশি আর একটি শব্দ দেখা দিয়েছে ‘মনস্তাপ’। ‘মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া’—এই লাইনের একটি মানে এই যে শুধু শরীরের তাপ নয়,মনের তাপ(বা মমতা) দিয়েও ফাটা ডিমে জোড়া লাগানো যাবে না। কিন্তু আরো একটি মানে আছে, ‘মনস্তাপ’-এর আভিধানিক অর্থ অনুশোচনা। সুতরাং ‘অনুশোচনার দ্বারা ফাটা ডিমে জোড়া লাগানো যাবে না’—দ্বিতীয় মানে এই। কিন্তু উটপাখির মনে অনুশোচনা জাগবে কেন ?অনুশোচনা তো কৃতকর্মনির্ভর। তবে কি ডিমটি ফেটে যাওয়ার জন্য উটপাখিই দায়ী এবং সেইজন্যই তার মনে অনুশোচনা? ...মনে হয় তা-ই। লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে ঊটপাখি তার ডিমের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকেই তাকে জীবনদান করে; যদি কখনো তার দৃষ্টি ব্যাহত হয়,সঙ্গে সঙ্গে সেই ডিমে পচনের ক্রিয়াও শুরু হয়। তখন ঊটপাখি নিজেই সেই আক্রান্ত ডিমটিকে ফাটিয়ে ফেলে। সুধীন্দ্রনাথ ,আমার মনে হয়, উটপাখির এই লোকপ্রসিদ্ধ স্বভাধর্মকে এইখানে ব্যবহার করেছেন। পূর্বালোচিত স্তবকে আমরা উটপাখির আত্মপ্রবঞ্চক স্বভাবের মধ্যে আত্মরক্ষার তাগিদ লক্ষ করেছি; সন্তানচিন্তা নয় ,আত্মচিন্তাই তার কাছে বড়ো। সুতরাং এই সংকীর্ণআত্মপ্রীতি থেকে ভ্রূণের প্রতি অবহেলা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার অজান্তেই অবহেলা কখন অবক্ষয়ে পরিণত হয়েছে—আত্মরক্ষার সংকীর্ণ তাগিদে সে বংশরক্ষার দায়িত্ব বিস্মৃত হয়েছে। পরবর্তী লাইনে ক্ষুধার প্রসঙ্গ এনে কবি উটপাখির এই আত্মপ্রীতিকেই যেন বিদ্রূপে গাঁথলেন। ‘সন্তানকে খেয়েছো,অবশেষে কি নিজেকেও খাবে?’ এই-ই যেন কবির বক্তব্য। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কবির জানা; তাই তিনি উটপাখিকে পরামর্শ দেন, ‘কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া’।এই দুটি লাইনের অর্থ এই যে ,বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্যের দরকার তা যখন দুর্লভ এবং আত্মভুক হওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন কী করে বাঁচা যাবে ?শূন্যে তো বাঁচা যায় না। এখানে ‘শূন্য’ শব্দটির দ্বিবিধ মানে। প্রথমত ,বস্তুর অভাব। প্রাণীমাত্রেরই বাঁচার জন্য চাই অবলম্বন,বস্তুর ভর, ভূত্বকের স্পর্শ। উটপাখিও ব্যতিক্রম নয়। দ্বিতীয়ত,সময়লুপ্তি। যে ত্রিকালপ্রত্যাখ্যাত , যার অতীত ও ভবিষ্যৎ কোনো কালচেতনাই নেই,সেই শূন্যজীবী। আর একটু বিশদ করে বলা যায় যে,প্রাক্তন পাপের ভারে যে বর্তমানে নিরাশ্রয় এবং ভবিষ্যস্বপ্নে আস্থাহীন তার অস্তিত্ব নিরবলম্ব,শূন্যতার।’’ ৭

দেবতোষ বসু মনে করেছেন, কবিতাটি যদিও চারটি সমান স্তবকে বিন্যস্ত , তবু বক্তব্যের দিক থেকে এ-কবিতার প্রথমাংশ এখানেই সমাপ্ত। দ্বিতীয় অংশ যেন শুরু হয়েছে একটি উপদেশাত্মক বাক্যের বয়ানে :

তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,

সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও;

মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,

তুমি তো কখনও বিপদ্ প্রাজ্ঞ নও।

নব সংসার পাতি গে আবার চলো

যে-কোনও নিভৃত কন্টকাবৃত বনে।

মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,

খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে।।

‘কবি প্রথমেই উটপাখিকে যুক্তি দিলেন বালির সমুদ্রে ‘সাধের তরণী’ হবার। কিন্তু মরুভূমি সহসা সমুদ্রে পরিবর্তিত হলো কেন,এবং ঊটপাখি –তরণী? সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাগর জোয়ার-ভাঁটার দ্বন্দ্বে বিঘ্নময়…সাগরও মরুভূমির মতো দুর্গম ও দিগন্তবিস্তৃত। অধিকন্তু এখানে স্মরণ করা দরকার যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মরুভূমি ও সাগর তুল্যমূল্য… সুতরাং মরুভূমিকে সাগররূপে চিত্রিত করা পট-পরিবর্তন মাত্র, স্বভাব-পরিবর্তন নয়। কিন্তু উটপাখিকে ‘সাধের তরণী’ বলার কোনো যুক্তি আছে কি ? আমরা দেখেছি প্রথম কবি শিকারী-প্রসঙ্গে ঊটপাখিকে বলেছিলেন, ‘তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।’ অর্থাৎ উটপাখির যে রক্ষা করার ক্ষমতা আছে ,তা কবি আগেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এখন সে দুর্গম সমুদ্রে পারাপারক্ষম তরণী,কবির পক্ষে মুক্তিবহ। একমাত্র নৌকোই পারে সমুদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে ; সুতরাং উটপাখিকে তরণী হতে বলে কবি তাকে প্রবল প্রতিপক্ষ সম্পর্কেই সচেতন করে দিলেন,উটপাখির বেঁচে থকার আবশ্যিকতাও মূল্য পেল। কিন্তু উটপাখি স্বভাবধর্মে বিপদপ্রাজ্ঞ নয়; সে বিপদ থেকে পালিয়ে যেতে চায়,বিপদকে জয় করতে চায় না। তাই কবি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে মরুদ্বীপের খবর তারই জানা আছে সুতরাং মিথ্যা অস্থিরতা তাকে সাজে না। কবি তাকে নবসংসারের স্বপ্ন দেখান; সে নিঃসন্তান,নতুন করে সংসার না পাতলে ,প্রাক্তন পাপের বোঝা তাকে কখনো ছেড়ে যাবে না। এই সংসার পাতা হবে যে-কোনো কন্টকাবৃত বনে, যেখানে কবিও উটপাখির যৌথজীবন কাটবে সমুদ্রের নোনাজল আর মরুভূকীর্ণ খেজুরে।’’৮

তৃতীয় স্তবকে এই ঘরবাঁধার স্বপ্নকেই সম্প্রসারিত ক্যানভাসে পাতলেন সুধীন্দ্রনাথ:

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা

গ’ড়ে তুলব না লোহার চিড়িয়াখানা;

ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা

ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।

ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি,

শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে;

উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি।

পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজব না অমারাতে।

তোমার নিবিদে বাজাব না ঝুমঝুমি,

নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে;

সে-পাড়া-জুড়ানো বুলবুলি নও তুমি

বর্গীর ধান খায় যে ঊন্ তিরিশে।।

এ যেন কবির প্রতিশ্রুতি: ‘চোখ-ভুলোনো প্রচ্ছদের অন্তরালে লৌহ নিগড় দিয়ে বাঁধার কোনো আয়োজন থাকবে না—উটপাখিকে এক দর্শনীয় জন্তুবিশেষেও ব্যবহার করবেন না কবি…উটপাখি উড়তে পারে না,সুতরাং তার ডানা অনাবশ্যক। কিন্তু কবি সেই ডানা ছেঁটে ফেলার প্রগতিব্যবসায়ে বিমুখ।‘ক্রেতা’শব্দের মধ্যে ব্যবসার ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যবসা নয়,বরঞ্চ তিনি ভূশায়িত নিষ্ক্রিয় পালকে কায়ক্লেশের ক্লান্তি জুড়োনো পাখাই বানাবেন।‘শ্রমণশোভন বীজন বানাবো তাতে’—এই লাইনের ‘শ্রমন’ শব্দকে ধাতুগত অর্থে ‘ক্লান্তি’ হিসাবে গ্রহণ করা সংগত নয়। ইংরেজি অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ anchorite বা বনবাসী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ‘শ্রমণ’ অর্থে এখানে বনবাসী-ই ধরতে হবে এবং এই লাইনের সরলার্থ, ‘বনবাসীর পক্ষে মানানসই পাখা বানাবো তাতে।’এর মধ্যে একটু আত্ম-অনুকম্পার ভাব রয়েছে। এই অর্থই গ্রহণীয় বলে আমার মনে হয়; কেননা পূর্ব-স্তবকের ‘কন্টকাবৃত বনে’ ঘর বাঁধার সঙ্গে এই অর্থ খাপ খায়।... উধাও তারার চিত্রকল্প সুধীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি কবিতায় ব্যবহার করেছেন,সেখানে ঐ চিত্রকল্প নিরুদ্দেশযাত্রার ব্যঞ্জনাবাহী… ’৯।

দেবতোষ বসু আরও বলেছেন, ‘উটপাখির প্রাগৈতিহাসিক অনার্য ভাষায় (অগভীর ভাষায় হয়তো) অর্থহীন ও শিশুতোষ উল্লাসও কবির অনভিপ্রেত (‘ঝুমঝুমি’ শব্দের প্রয়োগ স্মরণীয়),আপন ভাবনাকে নির্বোধ লাভের পদানত করবেন না তিনি। কারণ উটপাখি তো ছেলে-ভুলোনো পাখি নয়,সে ছেলে-ভুলোনো ছড়ার বুলবুলিও নয়,যার প্রতিপত্তি অদ্যাবধি অব্যাহত।’১০ কিন্তু দেবতোষবাবু যেভাবে ‘বর্গীর ধান খায় যে ঊন্ তিরিশে’—পঙ্ ক্তিটি বর্তমানকাল-সূচক এবং ‘খায়’ক্রিয়াপদটির সূত্রে যেভাবে এই কবিতাটির সম্ভাব্য রচনাসাল হিসেবে ১২২৯-কে মেলানোর চেষ্টা করেছেন,পরবর্তী -গবেষণা সহমত পোষণ করেনি তাঁর সঙ্গে। ‘ক্রন্দসী’র (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) অন্যান্য কবিতার রচনাকাল১৯২৮-’৩৩এর মধ্যে রচিত এবং পৃথক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ হওয়ার সময় ‘উটপাখি’র রচনাসাল না দেওয়া থাকলেও, ‘সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সংগ্রহ’-এর (সম্ভবত শ্রী স্বপন মজুমদারের প্রচেষ্টায়) সূত্রে জানা যাচ্ছে যে,কবিতাটির আদত রচনাসন ১৯৩৪। এবং এই তথ্যকে মাথায় রেখেই আমাদের অনেক বেশি সঙ্গত মনে হয় হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা; যিনি মনে করেছেন ‘উটপাখি’ কবিতায় “প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে ১২২৯ য়ে পাশ্চাত্যের মন্দার রেফারেন্স”১১।

অর্থাৎ কিনা সেই ১৯২৯;অর্থনীতি’র এই গভীরতম মহামন্দা;Great Economic Depression বা Depression of 1929। অর্থনীতি’র এই গভীরতম ফ্যাঁসাদের হাত ধরেই এরপর ধীরে-ধীরে ঘনিয়ে আসবে ফ্যাসিবাদ। রাতারাতি দেউলিয়া হয়ে যাবে সবচেয়ে বড়ো অটোমোবিল ইন্ডাস্ট্রি ;ফোর্ড। মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা তার স্থাবর-অস্থাবর সহায়-সম্পত্তি’র মূল্য নেমে যেতে চাইবে হঠাৎ শূন্যের দিকে। আর মুনাফাখোর ,ফটকাবাজ ,আড়তদার বর্গী’র বাড়া হয়ে লুন্ঠন চালাবে এ’ পোড়া বঙ্গদেশেও।‘একদিকে ঘরে বাইরে ঘনিয়ে আসা সংকট আর অন্যদিকে একদিন-প্রতিদিনের নির্দায় নিরুত্তাপ বেঁচে থাকার বামনবৃত্তি—এই দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা যেন ঘোর অসহিষ্ণুতার কাঁধ’১২ ঝাঁকাবে ‘আততায়ী আগামীর সরীসৃপসদৃশ চলনে জনসাধারণের কিছু আসে যায় না দেখে কবি যেন ধিক্কারে’১৩ ফেটে পড়বেন , ‘বালিতে মুখ গুঁজে থাকা ‘উটপাখি’র মতো জ্ঞানপাপী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিকাকে যেন রূপকাশ্রয়ে’১৪ বলে উঠবেন :

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে

আমরা দু-জনে সমান অংশীদার;

অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে ,

আমাদের ’পরে দেনা শোধবার ভার।

তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।

অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?

আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।

ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে ।

অতএব এসো আমরা সন্ধি ক’রে

প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি :

তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে ,

তোমাকে ,বন্ধু ,আমি লোকায়তে বাঁধি।।

দীপ্তি ত্রিপাঠী বুদ্ধদেব বসু’র কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছিলেন: ‘প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সমাজে আধুনিক কবিতার জন্ম।প্রেম,ধর্ম। নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আধুনিক কবিদের মূল্যবোধে পরিবর্তিত হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী সুন্দরের সঙ্গে কুৎসিতকেও জীবনের প্রধান সত্য বলে মেনে নিল ও ঊনবিংশ শতকের ভদ্র শালীনতা এবং বুর্জোয়া মর্যাদাবোধ উড়িয়ে দিয়ে রক্ত-মাংসের আদিম জৈব রূপকে প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না।’১৫ এবং ‘উটপাখী’ যাঁরা পড়েছেন,তাদের কারো এটা বুঝতে অসুবিধা হল না ,উটপাখি-সেই ‘প্রতীকী মননের সার্থক নিদর্শন। সুধীন্দ্রনাথ যে-দেশকালের পরিধিতে জীবনযাপন করেছেন তাকে এককথায় বলা যেতে পারে ডেকাডেন্ট।অর্থাৎ এ যুগে পুরানো মূল্যবোধ দেউলে হয়ে গেছে ,নতুন কোনো মূল্যবোধও গড়ে ওঠে নি।এই ডেকাডেন্ট যুগেরই প্রতীকী কাব্য ‘উটপাখী’।’১৬কিন্ত একথা মানি বলেই সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও উপেক্ষা করতে পারি না,যখন তিনি বলেন: “ ‘উটপাখি’[খী] কবির নিজেরই আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন সৌন্দর্য সত্তার প্রতীক।যে ‘আমি’ বাঙ্ময় ,সে বাস্তবের প্রাণবান স্রোতের প্রতীক। যে-মরু পরিহারের প্রেরণা তার কন্ঠে ,সে-মরু বন্ধ্যা অস্তিত্বের স্মারক।’’১৭আমাদের উপলব্ধির সঙ্গে তখন কোনো বিরোধ তৈরি হয় না। কারণ ,কবি স্বয়ং তো আসলে সেই নিখুঁত গণৎকার যিনি বোঝেন: ‘…ঝড় এসেছে। যুগান্তের ,কল্পান্তের ঝড়। এ-ঝড়ের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। ’১৮ উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে চলবে না আর। আত্মদায় অস্বীকার করেন না তিনি। স্বীকার করেন ধ্বংসের দায়ে তাঁর ও তাঁর Ulter Ego উটপাখির সমান দায়িত্ব। আর এই কবিতায় ‘সেই ধ্বংসের রূপ হচ্ছে নিস্তারহীন অনুর্বরতা, বদ্ধমূল নৈরাশ্য।’১৯ দীপ্তি ত্রিপাঠী সেই কারণেই বলেন : ‘ ‘‘উটপাখী’’ কবিতাটির মধ্যেও এইরকম অনেকগুলি ব্যজ্ঞনা… নিষ্ফলা যুগের মানুষকে এলিয়ট Hollow Man আখ্যা দিয়েছিলেন,সুধীন্দ্রনাথ তাদের দেখেছেন উটপাখীর চিত্রকল্পে। পুরাতন মূল্যবোধ পরিবর্তিত হ’য়ে গেছে; ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত উটপাখীর মতোই সে রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হ’তে চায় না ,বরং বালিতে মুখ গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সকল সৃষ্টি-সম্ভাবনা যে তিরোহিত হয়েছে এই চৈতন্য তার কিছুতেই জাগ্রত হচ্ছে না... কিন্তু উটপাখীর প্রতীকে কেবল আত্মপ্রবঞ্চিত মানুষের কথাই ব্যঞ্জিত হচ্ছে না।কবিতাটির গঠন তথা চিত্রধর্মে ভালেরির ‘পামগাছ’ও ছায়া ফেলেছে এ-কথা পূর্বেই বলেছি।ভালেরি যেমন কল্পনা করেছেন মরুভূমির মতো শূন্য বন্ধ্যা জীবনে একমাত্র আশ্রয় হ’ল চৈতন্যরূপী পামগাছ,যদিও তার ছায়া স্বল্প ওক্ষণস্থায়ী,তেমনি সুধীন্দ্রনাথও বলেছেন বর্তমানে আচ্ছন্ন হ’লে এই চৈতন্যই একমাত্র আশ্রয়।...আত্মধ্যানের পথে বিনাশ,ইন্দ্রিয় তাকে সেই সমাধি থেকে কর্মের দিকে নিয়ে আসছে এ-দ্যোতনা স্পষ্ট। একটি চিত্রকল্পে এতগুলি ব্যঞ্জনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব’লেই “ঊটপাখী” কবিতাটি সার্থক প্রতীকধর্ম লাভ করেছে। তা কখনো চৈতন্যের , কখনো কবিপ্রতিভার ,কখনো পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, কখনো বা বিরাট অজ্ঞেয়তার আবর্তে পরিত্যক্ত অস্তিত্ববাদীর অসহায়তার ব্যঞ্জক।’২০ দেবতোষ বসু এই উটপাখিকেই হয়তো বলবেন মানুষের আত্মধ্বংসী-অবক্ষয়ী জাতিসত্তার Totem! কিন্তু চিত্রকল্প বা Totem যাই হোক না কেন, ‘ভারাতুর ভাবীকালের দিকে তাকিয়েই কবি বোঝেন যে, অন্য সবাই যেহেতু নিজেদের পাওনা আদায় করে নিয়েছে সুতরাং তাঁদের দুজনের উপরেই ‘দেনা শোধবার ভার’। এই অন্যেরা তাঁদের পূর্বপুরুষ,সমসাময়িক নন,কেননা উটপাখি এবং কবি দুজনেই তাদের সময়ের শেষ প্রতিনিধি(বিবর্তনবাদ অনুসারেও উটপাখি তার গোষ্টীর শেষ জীবিতপ্রতিনিধি)। তাই উটপাখির অত্মরতি ,তার সংকীর্ণ স্বার্থচেতনা কবির পক্ষে অসহ্য—তিনি জানেন আত্মপ্রবঞ্চনার দ্বারা প্রলয়কে বন্ধ করা যায় না…উটপাখির ভ্রান্তিবিলাস ও স্বানুগত্য তার ক্ষতির পরিমাণকেই বাড়িয়ে দেবে।উটপাখি ও কবির অতীতের সঙ্গে যদি বর্তমানের সন্ধি না হয় তবে ভবিষ্যৎ তমোমগ্ন হতে বাধ্য—‘অতএব এসো আমরা সন্ধি ক’রে’,এখানে ‘সন্ধি’ শব্দটি কালগত অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই কবি বিরোধী স্বার্থকে তৃপ্ত করে পারস্পরিক উপকারের প্রস্তাব করেন—উটপাখি বন্ধবিমুখ,সে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু পালিয়ে বাঁচা অসম্ভব,সন্তানের মধ্য দিয়েই বাঁচা যায়। তাই কবি তাকে লোকায়তে বাঁধতে চান তারই উপকারের জন্য। পক্ষান্তরে ,মানুষ চতুর্বেষ্টি,ক্ষীণায়ু। বংশরক্ষাই তার অন্যতম কামনা। এবং বংশরক্ষার ক্ষমতাই যেহেতু তাকে কিছুটা মৃত্যুঞ্জয় করে (প্রসঙ্গত ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থের ‘প্রগতি ও পরিবর্তন’ প্রবন্ধ পৃঃ ২৬২ দ্রষ্টব্য)। তাই কবি বলেন, ‘তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে।’তাঁর ইংরেজি অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ ‘লোকোত্তর’ অর্থে ‘world beyond’ ব্যবহার করেছেন।’২১

দেবতোষ বসু প্রশ্ন তুলেছেন , ‘লোকোত্তর’ শব্দটির মধ্যে কোনো অলৌকিকের আভাস আছে কি না? সম্ভবত না । সম্ভবত , ‘ কবিতাটির শেষ দুই চরণে দ্বান্দিক সমগ্রতার ভিতর দিয়ে কবিজীবনের অন্তহীনতার ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে।’২২ সম্ভবত ‘ লোকায়ত ও লোকোত্তর উভয় জীবনের প্রতিই কবির আসক্তি অস্খলিত রয়েছে।’২৩ সজীব-সুন্দর বাঁচার লক্ষ্য হিসেবে এ যুক্তি উড়িয়ে দেবার নয়।

**তথ্যসূত্র :**

১। দেবতোষ বসু ,এপ্রিল ১৯৯৮ : উটপাখী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ,কবিতা –পরিচয় (সম্পাঃ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী) , ১ম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত স্বর্ণাক্ষর সং (১ম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮১),কলকাতা, পৃঃ ১৪১-১৪২

২। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,পৌষ,১৪১১ :প্রসঙ্গ সংবর্ত : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ব্যক্তি ও বিশ্ব, কবিতা নিয়ে ,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ(১ম প্রকাশ),কলকাতা,পৃঃ৫১

৩। দেবতোষ বসু ,এপ্রিল ১৯৯৮ : উটপাখী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ,কবিতা –পরিচয় (সম্পাঃ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী) , ১ম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত স্বর্ণাক্ষর সং (১ম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮১),কলকাতা, পৃঃ ১৪২

৪। ঐ

৫।অশ্রুকুমার সিকদার,ডিসেম্বর ১৯৯৯ : হাজার বছরের বাংলা কবিতা ,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি(প্রথম প্রকাশ),কলকাতা,পৃঃ১২৯

৬। দেবতোষ বসু ,এপ্রিল ১৯৯৮ : উটপাখী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ,কবিতা –পরিচয় (সম্পাঃ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী) , ১ম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত স্বর্ণাক্ষর সং (১ম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮১),কলকাতা, পৃঃ ১৪২

৭।ঐ: পৃঃ ১৪২-১৪৩

৮। ঐ: পৃঃ ১৪৩-১৪৪

৯।ঐ: পৃঃ ১৪৪

১০।ঐ: পৃঃ ১৪৫

১১। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,পৌষ,১৪১১ :প্রসঙ্গ সংবর্ত : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ব্যক্তি ও বিশ্ব, কবিতা নিয়ে ,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ(১ম প্রকাশ),কলকাতা,পৃঃ৫২

১২।ঐ

১৩।ঐ

১৪। ঐ: পৃঃ ৫১

১৫। দীপ্তি ত্রিপাঠী,নভেম্বর:আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,দে’জ পাবলিশিং(ষষ্ট সংস্করণ),কলকাতা,পৃঃ৬৬

১৬।জগদীশ ভট্টাচার্য,আগস্ট ২০০৪:আমার কালের কয়েকজন কবি,ভারবি(পুনর্মুদ্রণ),কলকাতা,পৃঃ৫৫

১৭।সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ,অক্টোবর,২০০০:বাংলা কবিতার কালান্তর,দে’জ পাবলিশিং(পরিমার্জিত ওপরিবর্ধিত ১ম দে’জ সংঃ),কলকাতা,পৃঃ১৯৫

১৮। জগদীশ ভট্টাচার্য,আগস্ট ২০০৪:আমার কালের কয়েকজন কবি,ভারবি(পুনর্মুদ্রণ),কলকাতা,পৃঃ৫৫

১৯। দেবতোষ বসু ,এপ্রিল ১৯৯৮ : উটপাখী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ,কবিতা –পরিচয় (সম্পাঃ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী) , ১ম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত স্বর্ণাক্ষর সং (১ম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮১),কলকাতা, পৃঃ ১৪৬

২০। দীপ্তি ত্রিপাঠী,নভেম্বর:আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,দে’জ পাবলিশিং(ষষ্ট সংস্করণ),কলকাতা,পৃঃ১৯৭

২১। দেবতোষ বসু ,এপ্রিল ১৯৯৮ : উটপাখী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ,কবিতা –পরিচয় (সম্পাঃ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী) , ১ম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত স্বর্ণাক্ষর সং (১ম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮১),কলকাতা, পৃঃ ১৪৬

২২। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ,অক্টোবর,২০০০:বাংলা কবিতার কালান্তর,দে’জ পাবলিশিং(পরিমার্জিত ওপরিবর্ধিত ১ম দে’জ সংঃ),কলকাতা,পৃঃ১৯৫

২৩। জগদীশ ভট্টাচার্য,আগস্ট ২০০৪:আমার কালের কয়েকজন কবি,ভারবি(পুনর্মুদ্রণ),কলকাতা,পৃঃ৫৬

জীবন যন্ত্রনায় অন্তর্জলি যাত্রা

ড. নিত্যানন্দ মন্ডল

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা নিয়ে যে সমস্ত লেখক গোষ্ঠী কলম ধরেছিলেন, তাদের মধ্যে কমল কুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) অন্যতম। সামাজিক প্রথা, সংস্কার, আচার-আচরণ, নীতি নিয়ম নিষ্ঠা প্রভৃতি মানুষের জীবনে যে কি ভয়াবহতা সৃষ্টি করতো তা কমল কুমার তুলে ধরেছেন তাঁর ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ (১৩৬৯) উপন্যাসে। উপন্যাসের শুরুতে পাই আশিতিপর বৃদ্ধ সীতারামকে। যার মৃত্যুকাল উপস্থিত- ‘অধুনা খড়ের বিছানায় শায়িত, তিনি যেমত বা স্থিতপ্রজ্ঞ, সমাধিস্ত যোগীসদৃশ, কেবল মাত্র নিস্পলক চক্ষুদ্বয় মহাকাশে নিবদ্ধ, স্থির তিলেক চাঞ্চল্য নাই, প্রকৃতি নাই-ক্রমাগতই বাঙ্‌ময়ী গঙ্গার জল ছলাৎ তাঁহার বিশীর্ণ পদদ্বয়ে লাগিতেছে’। দুই পুত্র বলরাম ও হরে রাম মৃত্যু পথযাত্রী পিতার পাশে উপস্থিত। সীতারামের কানে ‘গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম’। মন্ত্র শোনানো হচ্ছে। নাকে কানে তুলো গোঁজা। চোখের উপর তুলসী পাতা দেওয়া। এমত পরিস্থিতিতে জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ অনন্থরি গণনা করে বললেন সীতার ‘দোসর নিয়ে যাবে’। অনন্তহরির এই অভিমত সত্য করার জন্য বলাভাদ সমাজ রক্ষকদের কায়েমী স্বার্থকে কায়েম করার জন্য তারা বিভিন্ন ফন্দী-ফিকির খুঁজতে লাগল, শ্মশানের রক্ষক (ডোম) বৈজু চাঁড়াল ‘দোসর নিয়ে যাবে’ কথাটি শুনে ক্ষিপ্ত রাগে প্রতিবাদ করে। কিন্তু নীচুজাত বইজুর কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয়না।

সময়ের সাথে সাথে সীতারামের জ্ঞান ফেরে। তখনই সীতারামকে দোসর হিসেবে নিয়ে আশা হয় যশোবতীকে। লক্ষ্মীনারায়নের ষোড়শী কন্যা যশোবতী। যাকে কুলীন পাত্রে সমর্পণ করে লক্ষ্মীনারায়ণ ও তাঁর পত্নী স্বর্গের পথকে প্রশস্ত করতে চায়। বিয়ের কথা শুনে সীতারাম সম্মতি জানায়। জানাবেই বা না কেন। কারণ-

‘বিবাহ এক রক্তের নেশা

বর বৌ যেন বাঘের মত,

বাঘ বাঘিনী রক্ত চোষা’

আর সীতারম যার মাড়িতে একটিও দাঁত নেই, কেবল বাচ্চা ছেলের মোত সে মাড়ি চুষতে থাকে। তার মাড়ি চোষার শব্দ সম্মতির লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। বিয়ের সমস্ত আয়োজন করা হয়। নাপিত ব্রাহ্মণ সবই সমাজ রক্ষকদের হাতের কাছেই থাকে। তবে ব্রাহ্মণ রুপোর মুদ্রা না পেলে বিয়ের মন্ত্র পড়তে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত যার ছোঁওয়ায় জাত থাকে বলে যাদের ধারণা, তারাই বৈজু চাড়ালের পয়সায় সীতারাম ও যশমতি বিবাহ সম্পন্ন করে। অবশেষে মালা বদলের পালা। সীতারামকে কোনক্রমে তুলে ধরলেও সে মালা পরাতে পারে না। শ্মশানের দমকা হাওয়ায় সীতারামের হাত থেকে মালা পড়ে যায়। যশোমতী তাঁর মালাটি সীতারামের গলায় পরিয়ে দিয়ে বিয়ের পর্ব চুকিয়ে দেয়।

শ্মশান সংলগ্ন নদীর পাড়ে চারটি খুঁটি পুঁতে সীতারাম যশোমতীরা বাসর ঘর সাজানো হয়। সামিয়ানা টানিয়ে খুঁটির মাথায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে গড়ে ওঠে সে ঘর। কালের নিষ্ঠুর ক্ষত চিহ্ন সমন্বিত সীতারামের গায়ে শক্তি ফেরানোর জন্য যশবতী দুধ জোগাড় করতে যায়। ফিরে এসে যশবতী দেখে কোটলের টানে সীতারাম নদী গহ্বরে হারিয়ে গেছে। সে উন্মাদের মত খুঁজতে থাকে। কিন্তু শ্মশানের কাঠ ছাড়া আর কিছুই ফিরে পায়না।

২

অন্তর্জনী যাত্রা মূলতঃ সামাজিক উপন্যাস। সমাজ মনস্ক মানুষ ও তাদের মনের কথাকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের অন্তস্বর নির্মানে স্থান পেয়েছে দুটি গোষ্ঠীর কথা। একদিকে আছে সমাজ রক্ষক গণ। যারা সমাজের ভালোমন্দ, রিতি নির্ধারক। সমাজের হিতাহিত তারাই করে থাকেন। অন্যদিকে আছে কন্যাদায়গ্রস্থ অসহায় পিতামাতা। যারা কন্যাকে কুলীন পাত্রে দান করে স্বর্গের পথকে প্রশস্ত করতে চায়। অথচ তারা ভাবে না বিয়ের পরবর্তী পর্যায়ে সেই কন্যার কি হল। পতীর পুণ্যে সতীর পুণ্য- এই অনন্ত বাক্যকে মান্যতা দেওয়ার জন্য সমাজ রক্ষকেরা কুলীনের পত্নীকে পুড়িয়ে মারে। আর কৌশল করে নাম দেয় ‘সতীদাহ’। স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা নাকি পুণ্যের কাজ। সেই নারী নাকি সরাসরি স্বর্গে চলে যায়- এমনই বাক্যে শাস্ত্র পরিপূর্ণ করে রাখা হয়।

শুধু সমাজ রক্ষক বলব কেন? সমাজের সর্বপ্রকার মানুষকে এখানে সামিল করানো হয়। তবে সমাজ রক্ষকরাই ধ্বাজাধারী। সেই সাথে যোগ দেয় কুলীন পিতা মাতা। যারা কুলীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করাকে পুণ্যকাজ মনে করে। লক্ষ্মীনারায়ণ সমাজ রক্ষক না হলেও সমাজের চাপে বলা ভাল অর্থনৈতিক অনুশাসনে অসহায় পিতার মোট তাকেও কন্যাদান করতে হয়। কুলিন পিতা হওয়ায় লোভ সে সামলাতে পারে না। পিতামাতা সন্তান জন্ম দেয়। সন্তান লালন পালন করে। অথচ বিয়ের কালে সেই সন্তানের ভালোমন্দের কথা ভাবা হয়না। দেখা হয়না বিয়ের পর সেই কন্যা বেঁচে থাকলোনা মরে গেল। পতির চিতায় পুড়ে মরাকে পুণ্য ভেবে তারা মৃত্যু পথযাত্রীদের সাথে কন্যাকে সম্প্রদান করে। পিতামাতা নিশ্চিত জানে কন্যার শেষ পরিণতি কি হতে পারে। অথচ তারা সমাজ রক্ষকদের ভয়ে কিছু বলতে পারে না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমসাময়ীক অবস্থা সম্পর্কে লেখক ভালোভাবে সচেতন ছিলেন। আর সচেতন ছিলেন বলেই তিনি যশোবতীর জীবন কাহিনীকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

৩

যশোবতী। যশ ও খ্যাতি যার প্রাপ্য। স্বামী সোহাগিনী হওয়া যার একমাত্র লক্ষ্য। স্বামীর জীবনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে যিনি সারাজীবন কাটাতে চান। অথচ সেই যশোবতীকে অকালে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করা হয়; একমাত্র সীতারামের দোসর করানোর কারনে। শ্মশানে সীতারামের জ্ঞান ফিরলে যশোবতি তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেয়। আর এই মাল পরানোর বিয়ে নামক খেলার পরেই অচেনা অজানা অশতিপর এক বৃদ্ধা হয়ে ওঠে আজীবনের জীবন সাথী। ভাবতে অবাক লাগে এটাই মেয়েদের ভবিতব্য। অথচ এই মেয়েরাই স্বপ্ন দেখে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন। স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর কন্যার স্বপ্ন। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানোর স্বপ্ন। আর স্বামীর মৃত্যুর আগে শাঁখা সিঁদুর নিয়ে স্বামীর কোলে মাথা রেখে চির বিদায় নেওয়ার স্বপ্ন। যশোবতী কি এই স্বপ্ন দেখত না। অবশ্যই দেখত হয়ত। তাই পিতামাতার ইচ্ছের সাথে নিজের ইচ্ছেকে মিলিয়ে দিয়ে অশিতিপর বৃদ্ধকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যায়। বৃদ্ধ সীতারামের সন্তান জন্ম নেওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও তাঁর ইচ্ছা জাগে। মাঝে মাঝে যশোবতীর উরুতে থাপ্পড় মেরে তা জানান দেয়। আর যশোবতী সীতারামের ইচ্ছাকে বুঝতে পেরে মুখ টিপে হাসতে থাকে।

সীতারামের পুত্রদ্বয়, যারা পিতার শেষ যাত্রায় সামিল হয়েছে সম্পত্তির লোভে। সীতারাম তাঁর সিন্দুকের চাবি নিজের কাছে নিয়েই শ্মশানে এসেছে। যশোবতীর সাথে বিয়ে হওয়ার পর, যশোবতী সেই সংসারের চাবি নির্দ্ধিদায় ফিরিয়ে দিয়েছে। কারণ যশোবতী জানতো সীতারাম মারা গেলে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে। সতীদাহ করা হবে। তার পুড়তে দেখে কুলীন ব্রাহ্মণ তথা সমাজ রক্ষকরা যেভাবে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, তাতে তাদের ভয়ানক ললুপ আর একবার উপলব্ধি করা যাবে। সেই সাথে সমস্ত ভোগ্য নারী সমাজকে উৎসাহিত করা যাবে। তারা যেন স্বামীর মৃত্যুর পর স্ব ইচ্ছায় মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় উঠে পড়েন। এতে সমাজের রক্ষকেরা দু দিক দিয়ে লাভবান হবেন। অন্য নারীদের উৎসাহিত করার সাথে সাথে যারা এই দাহ দেখতে বসেছে, তারা সোনা-দানা, মুদ্রা দান করবে। যা প্রাপ্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের। যারা সমাজ রক্ষক। তাদের চীৎকার চেঁচামেচি, শাঁখ, ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজে যশোবতীর মোট নারীদের কান্নার আওয়াজ চিরতরে হারিয়ে যাবে।

৪

লেখক সমাজ জীবনের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর শিল্পি সত্ত্বা বা প্রতিবাদী সত্ত্বার বহিঃপ্রকাশকে তুলে ধরতে কসুর করেননি। চাঁড়াল বৈজুনাথের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিবাদ করার একটা চেষ্টা করেছেন মাত্র। ‘দোসর নিয়ে যাবে’-একথা শোনার পর বৈজুনাথ ‘শালা’ বলে উচু জাতকে গালাগাল দিয়েছে। সেই সাথে যশযবতীকে কনে বৌ বলে সম্বোধন করে বার বার সচেতন করতে চেয়েছে। এমনকি নিজের ইচ্ছেকে প্রকাশিত করতে তিনি ভোলেন নি। নিজের ভিতরের কোন ইচ্ছার কথা তিনি জানান দিচ্ছেন। নিজের ভিতরের কপাট অথচ গোপন ইচ্ছা। একটু ভালো করে বললে বলা যায় যে প্রতিটি নরনারির যে যৌন চেতনা থাকে, অর্থাৎ ফ্রয়েডিয় যৌন চেতনা, যাকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। সেই যৌন চেতনাকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যশোবতীর আগে এখানে অনেক মেয়েকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। বইজুনাথ তখন কি কোন প্রতিবাদ করেনি। তাহলে যশোবতীর বেলায় কেন বৈজুনাথ হঠাৎ প্রতিবাদী হয়ে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা কেন হঠাত নবকুমারকে বাঁচাতে তৎপর হল। এই প্রশ্নের যেমন কোন উত্তর মেলে না, বৈজুনাথের ক্ষেত্রেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। চাঁড়াল বৈজুনাথ, যশোবতীকে দেখে তাঁর মনের গোপন অথচ কপট ইচ্ছাকে কোন ভাবেই অবদমিত করতে পারছিল না। তাই যশোবতীর বিয়ে, তার ঘর সাজান, তার স্বামী সোহাগিনি হওয়ার ইচ্ছা, স্বামীর সেবা যত্ন এ সবই দেখে বৈজুনাথ হিংসা করেছে। সেই হিংসার গায়ের ঝাল মেটাতে শ্মশানের পোড়া কাঠ ও হাড়িতে লাথি মেরে নিজের অবদমিত রাগ কে প্রশমিত করার চেষ্টা করেছে। অথচ এই যশোবতি বৈজুনাথের কোন কথাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ।

তবে একটি বিষয় খুব স্বাভাবিক ভাবে সুষ্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বৈজুনাথের অনুপস্থিতি যশোবতীকে অসহায় করে দেয়। রাতের অন্ধকারে শ্মশানের ভয় ভিতিকে উপেক্ষা করার জন্য তাঁর অবশ্যই বৈজুনাথের প্রয়োজন। যে প্রয়োজন জীবনের। সীতারামের শরীরে শক্তি ও সাহস ফেরানোর জন্য তথা তাঁকে বলবান করার জন্য যশোবতী দুধ জোগাড় করতে গেছে। পথে বৈজুনাথ তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। যশোবতী চলে আস্তে চাইলেও পারে না। বৈজুনাথের কাছে সে ধরা দেয়। যশোবতীর শরীরের উপর বৈজুনাথ নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করলে যশোবতী নিজের মনে তৃপ্তি অনুভব করে। দৈহিক মিলন যশোবতীকে স্বর্গের সুখ এনে দেয়। রতি সুখের আনন্দে যশোবতী বৈজুনাথকে দুই বাহু দিয়ে সজরে জাপটে ধরতে চায়। ঠিক সেই সময় বৈজুনাথ সীতারামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে রাজি হয়না। তার মন থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে আসে ‘মুরক’ শব্দটি। শুধু যশোবতী বলব কেন সমস্ত যৌবনবতী নারীর মনের গোপন অথচ কপট ইচ্ছা এটাই।

শেষ পর্যন্ত যশবতী বৈজুনাথের কাছ থেকে মুক্ত হয়। কর্তব্য কর্ম করার জন্য সে সীতারামকে খঁজতে থাকে। কিন্তু কোথায় সীতারাম। কোটালের জল তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এক পক্ষকাল আগে যাকে গঙ্গার জ্বলে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, এক পক্ষকাল যশোবতীর সাথে থাকার পর সেই গঙ্গাই তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর যশোবতী জীবনের অমৃতের স্বাদ অনুভব করে জীবন মৃত্যুর পরপারে তাকিয়ে থেকে জীবনকে অনুসন্ধান করতে থাকে। যা কমল কুমারের মোট লেখকের লেখনীতে সত্য হয়ে ধরা দেয়।

যশবতী তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিবাদ কখনই করেনি। কারণ সমাজ শাসনে নিবিদ্ধ তাঁর জীবনে প্রতিবাদের হয়ত কোন জায়গা নেই। পিতা যখন তাঁকে সীতারামের সাথে বিয়ে দিয়েছে তখন সে সীতারামকে মেনে নিয়ে জীবনের মানে খুঁজতে চেয়েছে। আবার বৈজুনাথ যখন তাঁর জীবনে যৌন তৃপ্তির স্বাদ দিয়েছে তখনও সে তা গ্রহণ করেছে। তবে যশোবতীকে কি আমরা পরিস্থিতির স্বীকার বলে ধরে নেব। তা হয়ত নয়। কারণ যশোবতী যতই সীতারামের প্রতি কর্তব্য করুকনা কেন, তার মনের গোপন ইচ্ছেকে সে কোন মতেই অস্বীকার করতে পারে না। বৈজুনাথের তাগড়া চেহারা তাঁর জীবনের উৎসাহকে বাড়িয়ে দেয়। দৈহিক মিলনের সুখ পেতে গেলে সীতারাম নয়, বৈজুনাথকে যে প্রয়োজন তা যশোবতি বুঝেছিল। আর বুঝেছিল বলেই সে কোন প্রতিবাদ না করে জীবনে তৃপ্তি অনুভব করে সুখী হতে চেয়েছে। আবার ‘নরকে’ যাওয়ার কথা ভেবে তথা পাপের কথা ভেবে সীতারামকে খুঁজতে গিয়েছে; তাকে না পেয়ে চোখের জল ফেলেছে। কিন্তু কোন ভাবেই বৈজুনাথকে অস্বীকার করতে পারেনি। পারবেও না।

আসাদ চৌধুরীর কবিতা : বহুবিস্তৃত অর্থের দ্যোতনা

মামুন রশীদ

সাংবাদিক, দৈনিক মানদ কন্ঠ

বাংলাদেশ, ঢাকা

ঝাঁঝালো শব্দগুচ্ছ, রাগ, ঘৃণা আর অস্থিরতার যে তকমা এঁটে আছে ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতার গায়ে— তা যেন শুধুই কয়েকটি বিশেষণ। তাতে সত্যের ছিটেফোঁটা নেই। এই বাক্যটি অনায়াসে বলে দেয়া যায় আসাদ চৌধুরী (জন্ম : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩)’র কবিতা সম্পর্কে। একটি দশকের মূল প্রবণতা, যাকে আশ্রয় করে চিহ্নিত হয়েছেন, গৌরবান্বিত হয়েছেন অন্যরা, সেই পথ অবলীলায় ফেলে এসে নতুন পথের সন্ধান করেছেন। হতাশা, অবক্ষয় আর জীবনসংঘাতকে পরিপূর্ণ করে প্রকাশের বেদনায় নীলকণ্ঠ হয়ে আসাদ চৌধুরী ব্যক্তিক অনুভূতিপুঞ্জকে শব্দময় করে তুলেছেন নিজের মতো করে। গতানুগতিকতার ভেতর থেকে সচেতনভাবে বাইরে আসার দৃষ্টান্ত হয়ে হয়ে নিজের সময়-পর্বে চিহ্নিত হয়েছেন তিনি। একমুখী প্রচলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে, তাকে অস্বীকার করে নয়, বরং আ্ত্তস্থ করে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আসাদ চৌধুরী ষাটের দশকের কবিতায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন। বিরোধীতা এবং অস্বীকার যাকে কেন্দ্র করে শিল্প হয়ে ওঠার বিস্তৃত জগেক আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এ সময়-পর্বের কবিরা, তাদের সেই শৃঙ্খলার মধ্য থেকেই, চেতনের সঙ্গেই আসাদ চৌধুরী স্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যে আ্ত্তপ্রকাশের জায়গা করে নিয়েছেন। তাই তার কবিতায় অধঃপতিত জীবন ও অবক্ষয়ের ঢেউ থাকলেও, তাতে নেই বিশৃঙ্খলা, নেই আকৃতিহীন অনাস্বাদিত জীবনবোধ। মধ্যবিত্ত মানসিকতার হাওয়াকে ধরেই অন্তর্গত টানাপোড়নের মধ্য থেকে কবিতাকে নিজের জায়গায় দাঁড় করাতে চেয়েছেন তিনি। ফলে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে তার কবিতা পুরো ষাটের দশকের আবহে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘তবক দেওয়া পান’ প্রকাশ পায় ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রথম কাব্যগ্রন্থেই পাঠক আবিস্কার করে এক নতুন কিন্তু স্বাভাবিক এক স্বর। যে স্বরের মধ্য দিয়ে বাস্তব জগতের রূপ তার বৈপরীত্যময় চালচিত্র নিয়েই বহুবিস্তৃত অর্থের দ্যোতনা হাজির করে।

গোলাপের মধ্যে যাবো।

বাড়ালাম হাত

ফিরে এলো রক্তাক্ত আঙুল।

সাপিনীর কারুকার্য

নগ্ন নতজানু

চরাচরে আবেগ বিলায়।

আমার অধরে শুধু

দাঁতের আঘাত।

চাঁদের ভিতরে খাদ্য

আমাকে কেবল

নিয়ে যায়

নিঅনের কাছে

হায় দেহ, শুধুই শরীর

বিদ্যুবিহীন।

(আ্ত্তজীবনী : ১)

আসাদ চৌধুরী কি পলায়নবাদী? ভুলে থাকতে চেয়েছেন সময়, পালিয়ে থাকতে চেয়েছেন অন্ধকার থেকে? সমকালকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন? এমন ধারণার বিপরীতে আসাদ চৌধুরীর কবিতা স্পষ্ট করে তোলে- তিনি জীবন ও শিল্পচেতনার সমন্বয় খুঁজেছেন। তিনি নিরাসক্ত নন, তবে তার আসক্তি প্রমাণের জন্য তিনি ঝাঁ চকচকে, রাগী শব্দবন্ধকে ব্যবহার করেন নি। তিনি শিল্প বিনির্মাণের প্রশ্নে মনোযোগ দিয়েছেন মননশীলতার প্রতি। সেখানে উচ্চকিত এবং জোরালো ভাবের ব্যবহার নিশ্চিত করলেও বর্ণনার প্রশ্নে তিনি ধীর, স্থির। সেই স্থিরতা কিন্তু তার আবেগ তার প্রকাশকে বাঁধতে পারেনি বরং সেই স্থিরতার ভেতর দিয়ে বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। যা তাকে দিয়ে ধ্যানীর মগ্নতা। তাকে দিয়েছে ভেতর থেকে দেখা এবং উপলব্ধির স্থিরতা। ফলে আসাদ চৌধুরী সময়ের মধ্যে থেকেই সময়কে আ্ত্তস্থ করেই চেতনারস্রোতকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন। যাতে করে তার কবিতা অবদমিত ইচ্ছের কাছে হেরে না গিয়ে সময়কে বিবৃত করেছে শিল্পের সাধনার ভেতর দিয়ে। তার কবিতা, তার শব্দ পাঠককে বিব্রত করে না। কাছে টানে। সেই টানার মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের এবং ব্যক্তিমানসের অন্তর্বেদনার ছবি আঁকেন তিনি। যেখানে শব্দের নিজস্ব গতির বাইরে এসে তার শব্দরা খেয়ালি মনের বর্ণনায় মেতে ওঠে।

আশ্রয় না-দিলেও আশা দিয়েছিলে

এ-কথাটি কেমন ক’রে চেপে রাখি?

লক্ষ লক্ষ মালঞ্চের ঝড় বুকে পুরে

শূন্য হাতেই তোমার কাছে আসা।

হায়, তোমরা তো কেবল এর ভুল ব্যাখ্যাই শিখেছো এতদিন।

হে আমার ক্লান্তিহীন যাত্রার স্টেশন,

তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপে শুধু আমারই আঙুল পোড়ে কেন?

যদি আলোই না হয়,

কেন প্রদীপ মিছিমিছি আসাদের মতো জ্বলবে?

(যদি আলোই না হয়)

আসাদ চৌধুরী সকল অবরুদ্ধতার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিমনের সন্ধান করেছেন। সেই সন্ধানের ভেতর থেকে উঠে এসেছে অস্তিত্বসমস্যা, আ্ত্তসংকট এবং আ্ত্তভ্রমণের যন্ত্রণা। তিনি দৃশ্যের প্রতীকায়ণের চেয়ে তার বিশ্লেষণের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। সমাজ ও সময়কে মূল্যায়ণের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন তার বৈপরীত্য। ফলে তার একই কবিতার বহুকৌণিক ব্যাখ্যা এবং দ্যোতনা যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তেমনিভাবে তার সত্য আবিস্কারের নেশাও দৃষ্টিগাহ্য হয়ে ওঠে। শহরকেন্দ্রিক জীবন, যেখানে মানিয়ে নেয়া, খাপ খাইয়ে নেবার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতে থাকে বিচ্ছিন্নতাবোধ, যা মানুষকে করে তোলে স্মৃতিকাতর, আবেগায়িত। মানুষ ফেলে আসা সময়, গ্রাম যাকে যে ধারণ করে বুকের নিভৃতে তার জন্য বিপন্ন বোধ করে, সেই নৈঃসঙ্গ, সেই সংকটায়িত জীবনের দিকে, বা বিচ্ছিন্নতাবোধকে আসাদ চৌধুরী সঙ্গী করেন না। তিনি নৈরাশ্য বা সংশয়কে অতিক্রম করে সচেতনভাবেই হয়ে ওঠেন জীবনের গুণগ্রাহী।

বাতাসের জন্য ব’সে থাকতে হবে কেন?

আমিও কি বড়ো গাঙের সোয়ারি!

বাতাসের পরোয়া করি না।

হাঁটুতে ধুলোর চিহ্ন নিয়ে আমি

সবখানে যেতে পারি।

সঙ্গী-সাথী ব’সে আছে :

কখন বাতাস আসে?

সুবাতাস আসে!

টস্-টসে ফোস্কা পায়ে

মাথায় চৈত্রের ক্রোধ নিয়ে

একা একা হেঁটে যাবো।

(বাতাসের জন্য)

আসাদ চৌধুরীর কবিতা বিবৃতিময় না। তিনি অল্প কথায়, সীমিত শব্দের বন্ধনে ভাবকে মুক্তি দেন। অতীত এবং ভবিষ্যতের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি সেতুবন্ধনের সূত্র খোঁজেন। সেইসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রপ্রভাবকে স্বীকার করে, আ্ত্তস্থ করে ব্যক্তিত্ববোধকে নির্মাণ করেন। ত্রিশের দশকের বাংলা কবিতার স্ফুরণ ঘটেছিল রবীন্দ্রবিরোধীতার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার প্রভাবকে অস্বীকার করে কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে কবিতাকে আধুনিকতার ফ্রেমে ফেলার স্বেচ্ছাউদ্যোগের ধারা পরবর্তীকালেও চলে আসে। ষাটের দশকের যে অস্থির সময়-পর্ব, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন স্বপ্নের আশায় মানুষ নৈরাশ্য, দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে। যখন নিজেকে প্রকাশের, আ্ত্তবিবৃতির মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্তি দিতে চাইছে ভাবনাকে। সেই জটিল সময়াবর্তের ভেতর থেকে রবীন্দ্রনাথকে আ্ত্তস্থ করে রাবীন্দ্রিক শব্দপুঞ্জকে ক্রিয়াশীল রেখে শুরু থেকেই আসাদ চৌধুরী নিজেকে ব্যতিক্রম করে তুলতে চেয়েছেন। তাই তার কবিতায় ব্যবহূত শব্দে, উপমায়, বর্ণনায় বারে বারে ঘুরে আসে রাবীন্দ্রিক আবহ। যেখানে উজ্জীবিত হবার মতো উপাদান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কবির চেতনার মুক্তি অন্বেষাও।

যদিও মানুষের ডানাটি নেই আর

আকাশে উড়বার সাধটি রয়ে গ্যাছে,

কেমন করে ডানা খসলো মানুষের?

কেউ কি কেড়ে নিল? অসুখে ঝরে গ্যালো?

হায় রে উড়বার স্বপ্ন মানুষের।

তবে কি মানুষের সত্যি ডানা ছিলো?

কী জানি ছিলো বুঝি, হয়তো স্বপ্নের

মধ্যে উড়বার শক্তি পেতো তারা-

বৈমানিক জানে ঠিকানা আকাশের,

পাখিরা জানে শুধু কেবল উড়তেই।

আপন কোন্ জন, আকাশ তাই ভাবে-

মানুষ প্রিয় তার? না পাখি প্রিয়তর?

তবুও মানুষের স্বপ্ন থেকে যায়,

থাকলো আকাশের অসীম আয়তন,

কেবল উড়বার, কেবল ঘুরবার

কিন্তু মনে মনে কেবল মনে মনে।

(কিন্তু মনে-মনে)

আসাদ চৌধুরী সম্ভবনার কথা বলেন, আশাবাদী হতে শেখান, অনুসন্ধানী হতে উত্সাহী করে তোলেন তার পাঠককে। তবে তিনি এড়িয়ে যাবার মন্ত্রণা দেন না, বরং তার পরিনতিকে প্রকাশ করেন। ফলে তার কবিতা একান্তভাবে ব্যক্তিআশ্রয়ী হয়ে পড়ে না। ব্যক্তির বিবর্তনকে তিনি প্রাধান্য দিলেও তার কবিতায় মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে মানুষের বস্তুগত অবস্থান।

কেউ ঘরে এলে বড়ো খুশি হই।

সঙ্গে পোঁটলা থাকলে

শিশুরাও আনন্দে লাফায়।

একদিন খালি হাতে

যেতে হবে; জানি।

না ফেরার মতো অনিবার্য

জরুরি কাজটি

ঝটপট শেষ হ’য়ে যাবে।

এই চরাচরে

এ নিয়ে কতো যে

আশঙ্কার খেলাধুলা।

(না-ফেরার মতো)

আসাদ চৌধুরী ষাটের দশকের সময়-পর্বে লিখতে শুরু করে কবিতাই লিখেছেন। কবিতার আড়ালে অন্য কোন উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। সুদীর্ঘ কাব্যসাধনার ভেতর দিয়ে তিনি শিল্পের যে জটিল বিশ্বের দিকে নিজেকে উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন ষাটের দশকের বাংলা কবিতার পটভূমিতে কুসমাস্তীর্ণ না। শিল্পমীমাংসার প্রশ্নে শেষ কথা নেই। তবে হূদয়বৃত্তির যে সংবেদনশীলতার ভেতর দিয়ে আসাদ চৌধুরী নিজেকে প্রকাশের এবং ক্রমবিকাশের পথে এগিয়েছেন তার আন্তরিক প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে বিবেচনায় রেখেই পাঠক তার প্রতি মনোযোগী। কারণ সময়ের প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে এসে অস্তিত্বসংকটের প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে যখন বাকপরিবর্তনের প্রেরণাকে ধারণ করেন কবি, তখন তা স্বকালের জন্য যেমন তেমনি উত্তরকালেও আদরীয়।

মাঝিদের জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস : পদ্মানদীর মাঝি ও তিতাস একটি নদীর নাম

তাপস রায়

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ইন্দাস মহাবিদ্যালয়

নদীকে কেন্দ্র করে মানুষের আদিম সভ্যতা গড়ে উঠেছে। নদী মানুষের স্বভাব চরিত্র ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রন করে। তাই শিল্প সাহিত্যেও নদী বিভিন্ন রূপে উঠে এসেছে। বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যেও ধাত্রী নদীকে কেন্দ্র করে বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে। নদীর জল হল জীবন। জীবনের বিচিত্র রূপ ও প্রকৃতি ধরা আছে নদীর চঞ্চল জল ধারায়। আমি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বহু নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের মধ্য থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬) ও অদ্বৈতমল্ল বর্মনের “তিতাস একটি নদীর নাম” (১৯৫৬) উপন্যাস দুটির তুলনামূলক আলোচনার নিরিখে কিভাবে জীবনের বিচিত্র রূপ ও প্রকৃতি ধরা আছে তা দেখাতে চাইছি।

আলোচনার শুরুতেই উপন্যাস দুটির মূল কাহিনি বলা প্রয়োজন। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসটির বিষয় হল– পদ্মা একটি নদী। এই উপন্যাসের পটভূমিকাও রচনা করেছে এই নদী। তার তীরবর্তী কেতুপুর ও অন্যান্য গ্রামের জেলেরা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সময়ে মাছ ধরতে যায়। অধিকাংশ মানুষের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। কুবের গণেশ জাল নৌকা ব্যবহার করে পায় যৎসামান্য মজুরি। এই নিদারুন দারিদ্রের সঙ্গে আছে প্রকৃতির অত্যাচার এবং তীব্র সামাজিক বৈষম্য। এই জেলে সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষ গুলি দূরে সরিয়ে রাখে। এই অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য গোপনে কখনো সাহায্য করে হোসেন মিঞা। স্বার্থহীন সাহায্য ছিল না। তার উদ্দেশ্য কোন এক দুর্বলতার সুযোগে জনহীন, বন্ধ্যা রাজ্য তার ময়না দ্বীপে এদের নিয়ে যাওয়া। স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ যেতে রাজী নয়। মানসিক যন্ত্রণা অথবা কোন বিপদে মানুষেরা ময়না দ্বীপে যায়। যেমন এনায়েত-আমিনুদ্দী। কুবের তার পঙ্গু স্ত্রী মালার সঙ্গে লখা চন্ডী গোপী ছেলেমেয়েদের নিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেও মালার বোন কপিলাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। তবে রাসুর ষড়যন্ত্রে পীতম মাঝির টাকা ভর্তি ঘটি চুরির অভিযোগে কুবের কেতুপুর গ্রাম ছেড়ে ময়না দ্বীপে যাওয়ার কথা ভাবে, অবশ্যই সঙ্গিনী হিসাবে কপিলা থাকবে।

অন্যদিকে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে তিতাস একটি ছোট নদী। তার বিস্তার গঙ্গা বা পদ্মার মত নয়। সেই ছোট তিতাস নদীর তীরবর্তী গ্রামের মালো সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনকথা এই উপন্যাসের উপজীব্য। শুকদেবপুরে পঞ্চদশী কন্যার সঙ্গে গোকনঘাটের কিশোরের মালাবদল হয়। কিন্তু গোকনঘাটে ফেরার নয়া গাঙের মুখে ডাকাতরা মেয়েটিকে লুণ্ঠন করে। মেয়েটি সাঁতার কেটে আত্মরক্ষা করে। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ নামে দুই সহোদর জেলে। সেখানে জন্ম হয় অনন্তের। তবু ডাকাতে ধরে নিয়ে যাওয়া বধূর সমাজে স্থান নেই। এই দুশ্চিন্তায় ও আঘাতে কিশোর পাগল হয়ে যায়। গ্রামের ধনী জেলে পরিবার কালোচরন ও তার মা এক পোড়া ভিটেই অনন্তের মাকে থাকতে দেয়। বিধবার বেশে অনন্তের মা তার বিনয়, নম্ব্র, শান্ত-স্নিগ্ধ ব্যবহারে গ্রামের সকলকে মুগ্ধ করে। জালের সুতো কাটে জীবিকার জন্য। তার সঙ্গে দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তীর বন্ধুত্ব হয়। এই বাসন্তী এক সময় ছিল কিশোরের বাগদত্তা। পরে তাকে কিশোরের বন্ধু সুবল বিয়ে করে। কালোবরনের নৌকায় জন খাটতে গিয়ে সুবলের মৃত্যু হয়। নিঃসন্তান সুবলের বৌ বাসন্তীর ভালোবাসা অনন্তকে কেন্দ্র করে দুর্বার হয়ে ওঠে। অনন্তের জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

দুটি উপন্যাসেই এসেছে জেলেদের আচার আচারণ, সংস্কৃতি, শোষণ আর মাছধরার ইতিবৃত্ত। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে প্রেম পরিণয়, সুখ দুঃখ। দুটি উপন্যাসেই নদীর দার্শনিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। ‘নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে; কালও বহিয়া চলে ; কালের কথার শেষ নাই। নদীরও বহার শেষ নাই’। (তিতাস একটি নদীর নাম)। ‘মানবী প্রক্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মাতো চির যৌবনা’।(পদ্মানদীর মাঝি)। নদীর চিত্রকল্পও দুটি উপন্যাসে নানাভাবে জীবনের দ্যোতক হয়েছে। - ‘লন্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মনির মতো দেখায়’। অন্যদিকে ‘তিতাস একটি নদীর নামে দেখি’- ‘রূপার মতো রং, ছোটো ছোটো ঢেউয়ের মতো জীবন্ত’। এই রকম বহু চিত্রকল্প আছে উভয় উপন্যাসেই।

দুটি উপন্যাসেই নদী মাছমারাদের নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই নদী অদৃষ্টের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। নদী ছাড়া এখানকার মানুষদের অস্তিত্ব নেই। নদী তাদের জয়পরাজয়ের কাহিনি হয়ে উঠেছে। জেলেমালোদের জীবনে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতার স্বপ্নে কৃষিবিশ্ব, চাষির জীবন উঁকি মেরেছে। কিন্তু নদীর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এ জীবন নদীর বাইরে যেতে পারে না। এ মানুষ গুলির বাঁচার কাহিনিই উপন্যাস গুলিতে আলোচিত হয়েছে। পদ্মা নদীর মাঝিতে কুবের, গণেশ, হোসেন মিঞাদের নদী ছাড়া চিন্তা করা যায় না। ময়না দ্বীপ কুবের কাছে স্বপ্ন ও মৃত্যু দুইই। কোনটা পরিণতি পাবে তা নির্ভর করে ইতিহাস ও মানুষের ওপর। অন্যদিকে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এ দেখি নদীর জন্য একটা সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল। মালোদের জীবন ছিল জলে,ডাঙ্গায় তাদের মৃত্যু ঘটল। তারা জীবনের অবলম্বন পেল না। দুটির ক্ষেত্রেই নায়িকারা উচ্ছলা। তবে পদ্মা নদীর মাঝির কপিলার মতো তিতাস একটি নদীর নামের বাসন্তী প্রগলভা ছিল না ঠিকই কিন্তু চঞ্চলা ছিল।

উপন্যাস দুটি বিন্যাসে বেশ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও ভাবনাগত পার্থক্য বহু। উপন্যাস দুটির পরিণতির দিকে দেখলে দেখা যায় বেশ অমিল। কৃষক জীবনে প্রবেশ করেও কুবেরদের সংগ্রামের বোঝা হালকা হবার না। ‘তিতাসের’ আখ্যানে দেখা যায় ভাঙনে বৃত্তিচ্যুতির ইতিহাস। কিন্তু তিতাসপারের মালো সমাজের ভাঙনে মল্লবর্মন যেখানে দেখিয়েছেন মৃত্যুর ছায়া, মানিক সেখানে সর্দথক জীবনভাবনায় আস্থাশীল। তিতাসের সমগ্র কাহিনীটি কোন ব্যক্তির জীবন সংঘট্টের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায়নি। লেখক এক বিরাট ক্যানভাসে তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন দিনলিপি এঁকে গিয়েছেন। যেখানে সমবেদনা সহানুভূতি অভিজ্ঞতা অনুভব এবং জীবনতৃষ্ণা কোন কিছুরই অভাব নেই। এককেন্দ্রিক ঘটনা বিন্যাস অপেক্ষা বহুমাত্রিক ভাবসূত্র তিতাসের ঢেউ এর মতো নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে পদ্মাতে পদ্মা যাদের জীবন যাপনের উপকরণ যোগায়, স্তন্যদায়িনী মা রূপেই তাদের প্রতিপালিত করে। আবার নদীই তাদের স্বপ্ন ভেঙে দেয়। নদীর বুকের এবং তীরের দুই ধারের জগত ও জীবনকে মানিক এই উপন্যাসে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি দিয়ে, কোন ভাবাবেগ প্রকাশ না করে, কোন হ্রদয় দুর্বলতার পরিচয় না দিয়ে ছোট ছোট তথ্যের মতো করে প্রকাশ করেছেন। এবং প্রতিটি চরিত্র যেন নিজেদের জীবন ও বক্তব্য নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হয়েছেন। যেখানে লেখক সাধারণ দর্শকের মতো শুধু লক্ষ করেছেন নরনারীর গতি প্রকৃতি।

‘পদ্মানদীর মাঝি’ তে লেখক বিভিন্ন তত্ত্বের কম বেশি প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যেমন ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব, ইউটোপিয়া তত্ত্ব ও মার্ক্সীয় সমাজ তত্ত্বের। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এর ক্ষেত্রে এই জাতীয় কোন তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেনি। আবার দেখি পদ্মানদীর মাঝি নদী নির্ভর উপন্যাস হবার জন্য ভূমিকা তৈরি করলেও আসলে তা মাটির উপর দাঁড়াতে চাওয়া এক অনন্ত অতীত আর ভবিষ্যতের গল্প হয়ে ওঠে। অন্যদিকে তিতাসের মানুষ গুলো বেশ আলাদা। তিতাস তাদের জীবন রস। তিতাসের চর জাগতেই তাদের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা গেল শুকিয়ে। আসলে তিতাস অনিশ্চিত জীবন প্রবাহের গম্ভীর ছন্দটিকে ধরেছে। পদ্মার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। সেখানে যেন আধুনিক নাগরিক ভাবনার ডাক শুনা যায়। এক কথায় বলা যায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। জীবন যে সময়ের গতির সঙ্গে বাঁক নেয় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই-ই দেখাতে চেয়েছেন।

পরিশেষে বলতে পারি নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস গুলি আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে রচিত হলেও নদীর সঙ্গে মানব জীবনের ভালবাসারই বিস্ময়কর আখ্যান। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ ও ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস দুটিতেও বাংলার জীবন বৈচিত্রের এই রকম নানাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আসলে নদী যে কত রকম ভাবে মানব মন কে নিয়ন্ত্রণ করে এই দুটি উপন্যাস তারই বাস্তবোচিত দলিল বলা যায়।

ভাষা আন্দোলন ও আবুল বরকত : একটি বিশ্লেষণ

ড. এস.এম. সারওয়ার মোর্শেদ

প্রভাষক, বাংলাদেশ ষ্টাডিস, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি

বাংলাদেশ, ঢাকা

আজ থেকে ঠিক কতদিন পূর্বে মানুষের মুখের ভাষা প্রকাশিত হয়েছিল তা ঠিক করে বলতে আজ এ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানসম্মত, সঠিক, আধুনিক কোন স্বীকৃত কোন উত্স আমাদের জানা নেই। তবে যা জানা আছে, তা হলো মানুষ তার মুখের ভাষা প্রকাশ করে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য। আর তা জানার জন্য কোন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি জানার প্রয়োজন পড়ে না। সমকালিন মানুষের চরিত্র, বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত দেখলে এ কথা সকলের জানা। মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তার প্রয়োজন থেকে, আর এই প্রয়োজন এ নির্মার্ণ, নিমিত্ত, চাহিদা নিরুপণ করা একটি কঠিন বিষয়।

ভাষার জন্য রাষ্ট্র না ঠিক রাষ্ট্রের জন্য ভাষা, এই প্রম্ন থেকে কিন্তু আদিম মানুষ, প্রাচীন মানুষ বা মধ্য যুগের এর ভাষার চাহিদার উদ্ভব ঘটেনি। আর আধুনিক জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সোপান তা অন্যান্য কাছ থেকে মানুষ পর্যবেক্ষণ করে। আর এই প্রশ্ন আধুনিক জাতি রাষ্ট্রগুলোকে তা অত্যন্ত প্রকট ধারণ করে। মানুষ কিভাবে কথা বলবে, কিভাবে তার আচরণ প্রকাশ করেবে তা ভাষা ঠিক করে। রাষ্ট্রচরিত্র ভাষার নিয়ামককে নির্ধারণ করার প্রক্রিয়ায় চালু হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে মতামত দেয়ার মাধ্যমে।

এর ব্যতিক্রম আমরা দেখলাম নবগঠিত কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে অগ্রাহ্য করা হলো। নবগঠিত পাকিস্তান পূবাংশের রাজধানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এলো বাংলার পশ্চিমাংশের মুর্শিদাবাদের ভরতপুর এর বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেও দেশ ভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে এসে প্রাণ ত্যাগ করে মায়ের ভাষার জন্য।

৪৭’এ দেশ ত্যাগের পর নবগঠিত পাকিস্তানে বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিলো। আর মুর্শিদাবাদের বরকত ঢাকায় এসে জীবন দিলো। নবগঠিত পাকিস্তানেএসে ভারতীয় নাগরিক হওয়া স্বত্ত্বেও তিনি মায়ের ভাষার জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। কারণ তার কাছে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা রেখা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। আর রাজনীতির ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলা বিভক্তি তিনি মন থেকে নিলে ঢাকায় মায়ের ভাষার জন্য জীবন দিতেন না। অর্থাত্ রাষ্ট্রের বিভক্তি ভাষার প্রতি মমত্ববোধের ক্ষেত্রে কোন বিচ্ছিন্নতা তৈরি করতে পারে না তা বরকতের আত্মাহুতি প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় খড়গ/বিভেদনীতি ভাষাতে প্রতিফলন ঘটায় না১। একটি জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাঙালি হবার কারণে বরকত জীবন দেয়। তার জীবন দানের ঘটনার একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, মুর্শিদাবাদ আর ঢাকা রাজনৈতিক বিভাজন এর স্বীকার হলো। বাঙালি বরকত এর মানস ভূবনে কোন পরিবর্তন হয়নি। মায়ের ভাষার জন্য জীবন দানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি কাজ করে তা হলো, ভাষার প্রতি বাঙালির মমত্ব বোধের জায়গা চিরায়ত বরকত ভাষা আন্দোলন এর প্রথম শহীদ। অমর একুশে আজ আন্তর্জাজিত মাতৃভাষা দিবস। কে এই বরকত? আর কেনই বা ভিন্ন দেশে এসে মায়ের মুখের ভাষার জন্য প্রাণ দিল? ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এ হলো আবুল বরকত এর একাডেমিক পরিচয়। জন্ম-বাবলা গ্রাম, ডাকঘর-ভরতপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। এ হলো জন্মগত, স্থানগত বৃত্তান্ত। আর যে, কারণে আবুল বরকত তা হলো, ভাষার জন্য প্রাণ দেবার কারণে। প্রাণ দেবার স্থান-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা। ঢাকা মেডিক্যাল সংলগ্ন। প্রাণ দেবার কারণ-মায়ের ভাষার জন্য।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, মায়ের ভাষার জন্য, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এর ছেলে বরকত, ডাকা পূর্ববঙ্গ, পাকিস্তান এ প্রাণ ত্যাগ করলো কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরী। আর এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে যায় তা হলো, ৪৭’ এ দেশ ভাগ অর্থহীন, অবৈজ্ঞানিক, কল্পনা প্রসূত তা বরকত প্রাণ দেবার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে যারা প্রাণ দিলো তাদের মধ্যে বরকত শুধুমাত্র

ভাতরতের নাগরিক, আর যারা প্রাণ দিলো তারা পূর্ববঙ্গের নাগরিক। মায়ের ভাষার কোন পৃথক ভৌগোলিক সীমারেখা নেই, তা যে রাষ্ট্রীয় ফ্রেমওয়ার্ক এ বন্দী করে রাখতে পারে না, তা বরকত প্রমাণ করে।

ভাষা আন্দোলন এর মাধ্যমে, একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ।টভাবে প্রতীয়মান হয় তা হলো, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এর কারণে যে ভাষা আন্দোলন এর সূত্রপাত, তাতে একজন বিদেশী প্রাণ দিলো। অর্থাত্ ৪৭’দেশ ভাগের সময়ে এ কথা মনে রাখা হয়নি, বাঙালি জাতিস্বত্ত্বা এক, বাংলা এক, অভিন্ন বাংলার বাঙালি তার বাঙালিত্বের জন্য যে, কোন কিছুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

ভাষা ভিত্তিক জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের যে সংগ্রাম এর মিছিল তা বরকত কোন দেশের নাগরিক তা তিনি চিন্তা করেননি। যদি কেউ বলেন যে, বরকত বলপূর্বক বা ইচ্ছাপূর্বক বা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য পূর্ব বাংলা তথা পাকিস্তানে এসেছিল, তা একেবারে অসত্য। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বরকত এ মা ১৯৫৬ তে বাংলা যখন সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেলো পাকিস্তান এর প্রতম সংবিদানে তকন বরকত এর মা হাসিনা বেগম মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় শহীদ মিনার এর ফলক উন্মোচন করেন২।

ভাষা শহীদ বরকত জীবন দান করলো ঢাকায়, আর তার জন্য অপেক্ষা থাকলো তার অতীত মুর্শিদাবাদ, ভারত। ভারত ভেঙ্গে কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে বাংলার পূর্ব অংশকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারলেও বরকত এর মনকে ভেঙে ভাগ করতে পারেনি। ঠিকই বরকত স্থানিকতা, আঞ্চলিকতা, রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে ভুলে ঢাকার মায়ের ভাষার জন্য প্রাণ দেয়।

মাতৃভূমি বরকত পরিত্যাগ করলেও সাময়িকভাবে করেছিল তবে মাতৃভাষা তো আর সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করা যায় না। আর যদি যেত, তাহলে বরকত ভাষার জন্য জীবন দিতো না, ভাষার জন্য বরকত প্রাণ দিলো তথাকথিক পাকিস্তান এর ঢাকায় এসে, বাংলা যদি, ৪৭, এ ভাগ না হতো তাহলে হয়তো ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো। অর্থাত্ অবিভক্ত বাংলার রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য জীবন দিতে হতো না।

দেশ ভাগের তথা বাংলা ভাগের পরোক্ষ কারণ বরকত এর প্রাণ ত্যাগ বলে মনে করা হয়। পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিলো, যা মানুষকে মুক্তি দিবে বলে মনে করা হয়েছিলো। অর্থাত্ মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক মুক্তি ঘটবে বলে মনে করা হয়েছিলো। কিন্ত ঠিক সাড়ে চার বছরের মাথায় মুসলমান ধমের্র অনুসারী বাঙালির ভাষা বাংলা কথা বলার অধিকার চাইবার জন্য গুলি করে হত্যা করা হলো বাঙালি মুসলমান বরকতকে। মুসলমানিত্বকে বাঙালির মুখোমুখি দাঁড় করালো পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। বাঙালি জাতীয়তাবাদের কারণে বরকত প্রাণ দেয় একথা বলা যাবে না, তবে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দেয় তাতো নিঃশঙ্কচিত্রে বলা যাবে। মুসলমানদের উত্স স্থল হলো আরব। আরবী তাই মুসলমানদের গোঁড়া ভাষা। পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের উপর আরবী ভাষা চাপিয়ে না দিয়ে উর্দুকে চাপিয়ে দেয়। যদি শুধু ধর্ম রক্ষার জন্য হতো তাহলে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতো। তবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভাষা আন্দোলনকে হিন্দু, কমিউনিস্ট, ইসলাম বিরোধী আন্দোলন অভিহিত করে স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য।

মায়ের ভাষার জন্য বরকত জীবন দেয় এবং তিনি ভারতীয় নাগরিক তা স্বাধীন বাংলাদেশে, রাষ্ট্রীয়ভাবে, সামাজিকভাবে এবং সাংস্কৃতিক ভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

যার মধ্য দিয়ে বরকত এর রাষ্ট্রীয় পরিচয় মুখ্য না হয়ে ভাষা ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী পরিচয় মুখ্য হয়ে উঠে এর।

ভাষার বরকতকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার নিজের করে নিলো এ কারণে যে, বকত রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে, জন্মস্থান এর পরিচয়কে অতিক্রম করে ঢাকায় রাজপথে প্রাণত্যাগ করলো। আর এই প্রাণ ত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিস্বত্ত্বা যে, রাষ্ট্রীয় নয় নাগরিক পরিচয় মুখ্য হয়ে উঠলো। ভাষার জন্য যে ভারতের বরকত প্রাণ দিলো তা তো কারো অজানা নয়। তবে তা রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো অনযায়ী হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশে বরকত যে মুর্শিদাবাদের ছেলে হয়েও ঢাকা প্রাণ দিলো এ কথা স্বমস্বয়ে অনুচ্চারিত থেকে গেলো। এর এরকটি ভূ-রাজনৈতিক কারণ আছে। তা হলো পাকিস্তানের রাজনীতি বা পাকিস্তান আন্দোলন এর নেতা কর্মীরা ব্যর্থ রাষ্ট্র পাকিস্তান এর অনুসারী হয়ে গেলো।

যারা পাকিস্তান তৈরি করলো তারা ভাষা আন্দোলনে অংশ নিন এ কথা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভূলে গেলো। কারণ পাকিস্তান আন্দোলন এর কর্মী শেখ মুজিব, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন, গাজীউল হক প্রভৃতি ব্যক্তিরা রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন-প্রত্যক্ষভাব অংশগ্রহণ করলো, মানসিকতা ধারণ করলো। আর আবুল বরকত তা ধারণ করে প্রাণ দিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। ভাষার জন্য প্রাণ দিলো বরকত আর রাষ্ট্রের জন্য প্রাণ দিলো ৩০ লক্ষ শহীদ ১৯৭১ এর নিরস্ত্র থেকে সশস্ত্র হয়ে ওঠা বাঙালি। এখানে একটি বিষয় সম্পর্কে আত্ম উপলব্ধি খুব জরুরী। তা হলো বরকত থেকে যে প্রাণ দেবার পালা অর্থাত্ কৃত্রিম রাষ্ট পাকিস্তান এর প্রথম বাঙালি শহীদ যেদিন হলো সেদিন পাকিস্তান রাষ্ট্রের করব এর গত করার প্রথম সোপান এর ভিত্তি রচিত হলো৩।

৪৭’এ দেশ ভাগের সময় ১৪ থেকে ১৮ অগাস্ট মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানর পতাকা আর খুলনায় ১৪ থেকে ১৮ অগাস্ট ভারতের পতাকা উড়েছিলো একথা সবার জানা। আর সেই মুর্শিদাবাদ যখন ভারতের অন্তর্ভূক্ত হলো তখনও কিন্তু বরকত ভারত এর নাগরিক হলো রাজনৈতিক ভাবে, মানগতভাবে তিনি কিন্তু বাংলার থাকলেন, বাঙালির থাকলেন, বাঙালির সাংস্কৃতিকভাবে ঢাকার অর্থাত্ পূর্ব বাংলার রাজধানীর রাজপথে জীবন দিলেন।

বাঙালির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই শশাংক ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেছিলো আর তা ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র বাংলার আংশিক অংম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো। যে জাতি রাষ্ট্র বাঙালিকে তার উত্কর্ষতার চরম দিকে ধাবিত করলো। আর এই ধাবমান ইতিহাস অনেকটা অগ্রসরমানতার দিকে প্রতিনিধিত্বশীল প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করলো। ভাষা ভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বরকত একটি মাইল ফলক স্থাপিত করলো। আর সেই মাইল ফলককে সামনে রেকে স্বাধীন বাংলাদেশ বরকত কেন্দ্রিক একটি চর্চা অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হলো।

১৯৫২-তে ভাষা আন্দোলন হয় আর দেশভাগ হয় ১৯৪৭-এ। ঠিক ৫ বছরের মাথায় কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানেসাংস্কৃতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়, রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একদল নতুন নেতাকর্মীর আবির্ভাব হয়। আর পরিবর্তিত মানসিকতার অদিকারী নেতা-কর্মী’রা পাকিস্তানের জন্য চাপ প্রয়োগকারী একটি প্রতিরোধকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভাব ঘটলো। এই নতুন আবির্ভাব হওয়া প্রতিরোধ শক্তি পাকিস্তানের জন্য ধ্বংসের করণ হলো।

ভাষার আগে রাষ্ট্র এর আগে মানুষের সংস্কৃতিক নিরুপিত হয়। আর এই নিরুপিত সংস্কৃতিক বোধ তৈরি হয়। বরকত যে সাংস্কৃতিক বোধ নিয়ে প্রাণ দিলো, তা ছিলো নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই। আর নবগঠিত পাকিস্তানে সেই লড়াই একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলো।

ভাষা আন্দোলন রাষ্ট্রের পরিসীমা’র মধ্যে সে আটকে থাকলো না, তা আমরা দেখতে পাই ১৯৬১ তে শিলচর বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ উত্সর্গকারীদের ম্যাধমে। বাংলা ভাষার জন্য যারা জীবন দিলো তার যে রাষ্ট্রের পরিসীমা’র জন্য কোন চিন্তা করে না। বরকত ছিলো এমন এক ভাষা শহীদ যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অনুসঙ্গগুলো খুব নিবিরভাবে কাজ করতো।

ভাষা আন্দোলনের যে ব্যাপ্তি তাতে দেখা যায় যে, স্বকীয়তার দৃষ্টিকোন থেকে এই আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্র মধ্যব্তিত শ্রেণীর ক্রমবিকাশমান একটি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। প্রতম দিকে পুরোনো ঢাকার মানুষ জন ভাষা আন্দোলন এর বিরোধীতা করলেও পরে কুলবধূ’রা তাদের গহনা এবং সার্বিক সহযোগিতা ভাষা আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব সংগঠন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে দান করে। এই দান করার মত মানসিকতা বিনির্মাণ করতে পেরেছিলো বরকত। যার ফলশ্রুতিতে ভাষা আন্দোলন একটি সার্বজনীন আন্দোলনের রূপ লাভ করে৪।

বরকত যে কারণে ভাষার জন্য জীবন দেয় সেই একই কারণে অন্যান্যদের জীবন দেয়ার ইতিহাস এক হলেও রাষ্ট্রীয় পরিচয় এ সবাই ছিলো পাকিস্তানের নাগরিক, শুধু বরকত ছিলো ভারতের নাগরিক। ভারতীয় বরকত হয়ে গেলো বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রেরণার উত্স। বরকত যে কারণে মায়ের ভাষার জন্য প্রাণ দিলো তাতে দেখা যায়। ভাষার অধিকার, রাষ্ট্রের অধিকার ম্লান করলো, ভৌগোলিক সীমারেখা বাংলা ভাগের, ভারত ভাগের কৃত্রিম বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো ।

৪৭’এ দেশভাগের অব্যবহিত পরে বাংলা পাঞ্জাব ভাগের অমোঘ পরিণতি হলো উদ্বাস্তু মানুষ। আর কেউবা শরণার্থী হয়ে বাংলার পূর্ব আর পশ্চিম অংমে কেউবা পাঞ্জাবের পূর্ব আর পশ্চিম অংশে কেউ শিক্ষা গ্রহণের নামে, কেউবা চাকরির নামে স্থানান্তরিক হতো। এরই এক ধারাবাহিকতায় বরকত পূর্ব বাংলায় আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য। আর এই উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পথ সহজ ছিলো না। জীবন দিয়ে তাকে জীবনের জয়গান গাইতে হয়েছিলো। জীবনের সমস্ত চাওয়া, পাওয়াকে পিছনে ফেলে ভাষার জন্য বরকত জীবন দিলো, রাজনৈতিকভোবে জীবনকে দেখবার সুযোগ হলো। আর রাজনৈতিক কর্মসূচীতে না দিয়ে নিজের অস্তিত্বের কর্মসূচীতে বরকত গিয়েছিলো ২১ ফেব্রুয়ারী। বরকতকে কেউ প্ররোচিত করেনি ভাষা আন্দোলনের মিছিলে গিয়েছিলো স্বেচ্ছায়।

স্ব-প্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় মিছিলে গিয়ে আত্মিক তাড়না থেকে মুক্তি পেয়েছিলো। আর ইে আত্মিক তাড়না কেউ তৈরি করে দেয়নি। তা হয়েছিলো বাংলা মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণকারী বরকত এর নিজের ইচ্ছায়। রাষ্ট্রীয় প্রপঞ্চগুলো খুব জরুরী হয়ে পড়ে বরকতকে জানার জন্য। অবিভক্ত পাকিস্থানে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো ভাষা, কারণ রাষ্ট্রীয় প্রপঞ্চগুলো, জাতিস্বত্ত্বার পরিচায়ক স্তম্ভগুলো খুব জরুরী হয়ে পড়েছিলো পাকিস্তানের জন্য একটি রাষ্ট্রের পরিচায়ক হিসেবে। পরিচয়দানকারী একটি রাষ্ট্রের চরিত্র কি রকম তা জানা জরুরী।

ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম তার শুরুটা হয়েছিলো ১৯৪৭ সালের ১৫ইং সেপ্টেম্বর লিখিত “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু।” এই পুস্তিকা লেখার মাধ্যমে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই পুস্তিকার লেখক ছিলেন তিনজন-১. প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, ২. ড. মুঃ শহীদুল্লাহ, ৩. আবুল মনসুর আহমেদ। ভাষার লড়াই বাঁচার লড়াই-এ পরিণত হয় বরকতের আত্মদানের মাধ্যমে। কারণ ভাষার জন্য যে আবেগ পূর্ব বাংলার মানুষের ছিলো, তার রাজনৈতিক বাস্তবতা অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ বাঙালি ভাসার জন্য

জীবন দিতে পারে তা পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বুঝতে পারেনি৫।

ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রু প্রতিষ্ঠা হলো না ১৯৪৭-এ। ভাষার জন্য প্রাণ দিলো যে প্রজন্ম তারা এখন একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্ম দিলো, যার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব অসার হয়ে উঠলো। বাঙালি তার নিজের স্বকীয়তার জন্য অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা তা অব্যাহত রাখে। জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে যে ভাষার উত্পত্তি তাতে নানা রকম রাজনৈতিক সীকরণ থাকে। কে কোন জেলার, কে কোন অঞ্চলের, কে কোন দেশের, কিন্তু বরকত যে কোথাকার তার অস্তিত্ব বাংলা ভাষার মধ্যে লীন হয়ে গেছে। বাংলা ভাষার জন্যে, বাংলাদেশের জন্য জীবন উত্সর্গ করার যে প্রবণতা তা বরকত লালন করতো বলেই ভাষা আন্দোলনের মত একটি সার্বিস সার্বজনীন আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিলো।

ভাষা আন্দোলনের মাঝে যে বিষয়টি লুকিয়ে ছিলো তা হলো জাতিস্বত্ত্বার আত্মপরিচয়ের বিকাশের সুযোগ এবং তার সাথে সমসাময়িক রাজনৈতিক স্তরের সাধন। বরকত যে রাষ্ট্রের ভাষার জন্য জীবন দিলো তা ছিলো একেবারে অনন্য সাধারণ এ কারণে যে, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা আর মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ বরকতকে আমাদের চিনতে সাহায্য করে।

ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, আর রাষ্ট্রের সাথে ভাষার সম্পর্ক খুব নিবিড়। ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে লড়াই তা চিরায়ত। ভাষার জন্য যারা জীবন দিলো, তারা এমন একটি রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো নির্মাণ করতে চাইল যাতে বাংলাদেশ, বাঙালি, বাংলা ভাষা পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে পড়ে৬।

বাঙালির জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, আর এই রাষ্ট্র তার ভাষার অধিকার ফিরে পাবে তা খুব স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিলো।

ধমর্রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশ, আর জাতিরাষ্ট্রের অবস্থা যদি বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রের মত হয়, তাহলে তার অন্তর্নিহিত তাত্পর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের যে প্রক্রিয়া তার মধ্যে যে নিয়ামকগুলোর কাজ করে তা হলো রাষ্ট্রীয় অভিঘাত, ব্যক্তিগত আকাক্সক্ষা, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রভৃতি। ভাষার রাষ্ট্র কি হবে। আর রাষ্ট্রের ভাষা কি হবে, তা জানা খুব জরুরী।

রাষ্ট্রচরিত্র কেমন হবে, গঠন প্রক্রিয়া কি রকম হবে, এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর রাষ্ট্রীয় অবস্থানকে সুসংহত করে ভাষা। ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তরান্তিত করে ইতিহাস, ঐতিহ্য, দর্শন আর সাহিত্যকে। রাষ্ট্রীয় অনুসঙ্গকে বিনির্মাণ করে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিন্যাসকে নতুনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে।

সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান বাংলা, আর সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চগুলোকে একত্রিত করে ভাষা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জাতি রাষ্ট্র প্রপঞ্চ বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতিকে বুঝতে না পারা একটি বড় ঘটনা।

ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্রকে সামনে নিয়ে আসার জন্য যে নিয়ামক দরকার তা পাকিস্তানি শাসন পরিকাঠামোতে গভীরভাবে আসেনি। বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় থেকে বুঝতে পারা কঠিন হয়নি যে, ভাষার জন্য বাঙালি জীবন দিতে পারে। রাষ্ট্র যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে দেখা যায় ভাষাকে আরোপণ করতে পারে। যেমন-জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ, উর্দুভাষী, বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী জনগোষ্ঠী এর ভাষা বাংলাদেশে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবার প্রাথমিক দাবী পর্যন্ত হয়নি। আর নবগঠিত পাকিস্তানেবীর বাঙালির এর ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা’র মর্যাদা লাভ করে।

ভাষার লড়াই, বাঁচার লড়াই, মা’মা বলে ডাকার লড়াই, মানুষের চিরন্তন আকাক্সক্ষার প্রতিফলিত ভাষা আন্দোলনের মাঝে লক্ষ্য করা যায়।

ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে লড়াই তা’র মাঝে নিরবিচ্ছিন্ন ঘটনাকে নিতে পারাটি একটি বড় বিষয়। আমরা ভাষাকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি।

বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিতে পারাটা পৃথিবীর আর কোন দেশে ১৯৫২ সালের আগে কখনো ঘটেনি। ভাষা আন্দোলনের পর আমরা দেখতে পাই রাষ্ট্রের সরলীকরণ অবস্থা, ১৯৫৬’র সংবিধানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যখন আওয়ামী লীগ তখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী’র সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাঙালির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় থেকে ভাষা আন্দোলনের উদ্ভব এ কথা বলা ঐতিহাসিকভাবে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে উচ্তি হবে না। কারণ ভাষার জন্য দাবী থেকে রাষ্ট্রের দাবী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এগিয়ে নিয়ে যায়। কারণ ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে আর মুক্তিযুদ্ধ মুরু হবার প্রশ্নই আসে না৭।

ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে শশাংক শুরু করেছিলেন আর ১৯৭১-এ শেখ মুজিব তা পরিসমাপ্ত করেন। বরকত এর প্রাণদানের মাধ্যমে একটি কথাই আমাদের মনে হয় যে, ভাষার জন্য যে লড়াই বাঙালি শুরু করেছিলো তা রাষ্ট্র অর্জনের লড়াই-এ যেয়ে শেষ হয়।

ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তান গৌণ রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। বরকত ভাষার জন্য আন্দোলন করতে যেয়ে এমন একটি পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করলো যাতে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ উদ্বেলিত হয়ে পড়লো।

ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ মানুষ প্রাণপাত করলো। মানুষের বাঁচার ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা যুক্ত করলো। আর সেই মাত্রাগত ভিত্তিতে যে বিষয়টি অত্যন্ত প্রকট ভাবে দেখা দিলো তা হলো রাষ্ট্রীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্মীয় প্রপঞ্চ এর সংযোগ।

ভাষার জন্য প্রাণ দিলো যে প্রজন্ম তাতে অনেকেই যোগ দিলো। ইতিহাস, ঐতিহ্য আর রাজনৈতিক সচেতনতার মাত্রাগত ভিত্তি রচিত হলো। ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতবষের্র মানুষের ধারণ না থাকলেও, ১৯৫২ তে বরকত তা পরিচয় করিয়ে দিলো বাঙালিকে। রাষ্ট্র ভাষার জন্য মানুষের যে প্রাণদান করার প্রবণতা তৈরি করলো পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তা চূড়ান্ত করে দিলো।

বরকত যে ভাষার জন্য জীবন দিলো তা গভীরতা যে এতো ব্যাপক তা বোঝা গেলো অনেক মানুষের সম্পৃক্ততা আর আন্দোলনের তীব্রতা দেখে। পূর্ব বাংলার মানুষ এত তীব্র আন্দোলন এর আগে আর দেখেনি। চট্টগ্রাম খুব বিদ্রোহ, ১৯২২ এর অসহযোগ আন্দোলন, মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খিলাফত আন্দোলন, ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনের মাঝে রাজনৈতিক দাবী আদায়ের ইস্যু থাকলেও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার জন্য এ রকম আন্দোলন ভারতবষের্র মানুষ এর আগে দেখেনি। সংস্কৃতিক চর্চার জন্য মানুষের যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্ঠা তা আমরা গভীরভাবে লক্ষ করি ৫২,র ভাষার সংগ্রামে।

রাষ্ট্রের পরিচালনা করবার জন্য ভাষার দরকার আর সেই ভাষাকে জনমানুষকে সম্পৃক্ত করবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ কতা পাকিস্তানি ঝঃধঃব চড়ষরপু গধশবত্’ বা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন ১৯৫২’র ভাষা আন্দোলনের সময়।

ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র এই ভারত ভূমিতে হতে পারে (১৯৪৭ এর আগে বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র ভারতবষের্র একটি প্রদেশের পূর্বাংশ ছিলো) তা কোনদিনও কেউ ভাবতে পারেনি। কারণ ১৯৪৭-এ যেখানে ভারত ভাগ হয়ে গিয়েছিলো প্রচন্ড ধর্মীয় উন্মাদনার ভিত্তিতে সেখানে মাত্র ৫ বছরের মাঝে এরকম একটি আন্দোলনে ভারতের নাগরিক পাকিস্তানে এসে জীবন দিবে এটা ভাবার কোন কারণ পাকিস্তানীদের মাঝে ছিলো না।

তা, না হলে

জিন্নাহ’র মুখ্য সচিব আজিজ আহমেদ বাংলা ভাষার আন্দোলনকারীদের ভারতীয় দুঃস্কৃতিকারী এবং হিন্দুদের দালাল বলে অভিহিত করতেন না।

পাকিস্তান ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার যে গোড়াপত্তন হয়েডিছলো তা একটি ষড়যন্ত্রমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কারণ ১৯৩৩ এ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী পাকিস্তান শব্দটি উদ্ভাবন করার আগে পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজেই তা জানতেন না। জনক যদি সন্তানের জন্ম না দেন তাহলে কবির ভাষার বলতে হয় “জন্মই হলো আজন্মপাপ৮।”

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের প্রক্রিয়া এমন একটি ব্যবহার মধ্য দিয়ে হলো যে জন্মই হলো অবৈধ। বাঙালিদের মধ্যে যে জিনিসটা দেখা যায় তা হলো রাষ্ট্রীয় সংহতির বড় অভাব। কারণ রাষ্ট্র এমনভাবে গঠিত হয়েছিলো যে ৪৭’ এ পাকিস্তানকে আটকানোর মত কোন জবঃড়ত্রপ বা প্রভাবক স্বয়ং জিন্নাহর হাতে ছিলো না।

কারণ ভাষা আন্দোলন দুই পর্যায়ে হয়েছিলো ৪৮ এবং ৫২’ দুই পর্যায়ে সংগঠিত হয়েছিলো। আর আবুল বরকত প্রাণ উত্সর্গ করেচিলো ৫২’র অমর একুশে ফেব্রুয়ারীতে। সেদিন বরকত এর যা হাসিনা বেগম মুর্শিদাবাদ তেকে এসে ঢাকায় শহীদ মিনার উদ্বোধন করেছিলেন। ভাষা’র জন্য প্রাণ দিলো সন্তান আর মা তার স্মৃতি স্তম্ভ শিলান্যাস করলো। এর মাধ্যমে সে বিষয়টি আমাদের সামনে চলে আসে৯।

ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস তা আমাদের এক মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নিয়ে যায়। কারণ এই উপমহাদেশে আর কোন ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে রাজনৈতিক ইতিহাস তা অনেক গভীরে প্রোথিত আছে। এর কারণ হলো বাঙালিত্ব তৈরি হবার যে ঐতিহাসিক কারণ তার মৌলিক সংকট ছিলো এর দর্শনগত সংকট। একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে প্রচেষ্টা তা অব্যাহত ছিলো পাকিস্তান তৈরি হবার পর থেকেই। কারণ বাঙালি যেদিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজপথে নেমেছিলো সেদিনই তার আত্মপ্রচেষ্টার নানারূপ প্রকাশিত হয়। বাঙালির জন্য যে রাষ্ট্রীয় প্রপঞ্চ এর দরকার ছিলো তা একমুখী ছিলো। একটি বিষয় অত্যন্ত পরিস্কার যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম মূল উপাদান হলো ভাষা। আর ভাষার জন্য যে জাতীয়তাবাদী অবস্থান তা প্ররম্ভ হলো স্বয়ং পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীদের মাধ্যমে। যে প্রত্যয় নিয়ে পাকিস্তান তৈরি করেছিলো পূর্ববঙ্গের জনগণ তা ভেঙ্গে যায় ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। আবুল বরকত ভাষাভিত্তিক যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা বলা যাবে না কারণ মুক্তিযুদ্ধের আগে তিনি ভাষা শহীদ হবার গৌরব অর্জন করেন। আবুল বরকতকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রপঞ্চ আর মাথা ঘামায় না। কারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে করেই হোক আপন মহীমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আর চরিত্র এবং পরিকাঠামোগত অবস্থান মানুষকে রাষ্ট্র তৈরি করবার প্রেরণার যোগায়। আর প্রেরণা’র শক্তিগুলো আপেক্ষিকভাবে অন্যরকম যাত্রা যোগ করে১০।

বরকত ভারতবর্ষে এবং আজকের বাংলাদেশে সমানভাবে মর্যাদা লাভ করে ভাষা শহীদ হিসেবে। তবে যে তত্কালীন পাকিস্তানে অধ্যয়ন করতে এসেছিলো সেখানে তার কোন মর্যাদা নেই। কারণ পাকিস্তান একটি কৃতিম রাষ্ট্র ছিলো। বরকত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখা সেদিন মানেনি। রাষ্ট্র যে পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছিলো তার মূলে ছিলো রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র। কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা কোনদিনও একটি আদর্শ নিভর্র রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ধর্মীয় সমপ্রদায়গত বিদ্বেষ প্রকৃতি বিষয় নানাভাবে যুক্ত ছিলো। কারণ মানুষ এর মাঝে যে মানবিকতা কাজ করে তা তার ভাব প্রকাশের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ভাষাকে ধমের্র সমান্তরালে বিবেচনা করতো। সব ধমের্র মানুষ যে একই ভাষায় কথা বলে তা পাকিস্তানীদের জানা ছিলো না।

তথ্যপঞ্জি

১। ইসলাম, সৈআ ও বন্দোপাধ্যায়, কাজল ১৯৯৯, বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম

সামপ্রদায়িতার সক্টট, ঢাকাঃ জাতীয় গ্রস্থ প্রকাশন, -১৩

২। ইসলাম, মযহারুল,১৯৯৪, ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব, ঢাকাঃ আগামী প্রাকাশনী,

পৃষ্ঠা-১৩।

৩। ইসলাম সাইফুল, ১৯৮৭, স্বাধীনতা ভাষানী ভারত, ঢাকাঃ অয়ন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৪৭।

৪। উমর, বদরুদ্দিন, ১৯৯৬, সাংস্কৃতিক সামপ্রদায়িকতা, ঢাকাঃ গ্রন্থনা, পৃষ্ঠা-২৩।

৫। করিম, ফজলুল, ২০০০, বায়ান্নর কারাগার, ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১১।

৬। বকুল, ইসমাইল হোসেন, ২০০০, ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, রক্তঝরা একুশ, ঢাকা,

এশিয়া পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা-৫১।

৭। মুকুল, এম.আর. আখতার, ১৯৮৫, ৪০-৭১, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৬৩।

৮। ঐ, ২০০৪, শতাব্দীর কান্না হাসি, ঢাকা, অনন্যা প্রকশনী, পৃষ্ঠা-২৯।

৯। ঐ, ১৯৯৯, ২১ এর দলিল, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১৭।

১০। বাংলা ভাষা ও বর্ণমালার ব্যবহারঃ অতীত এবং বর্তমান, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর,

ঢাকাঃ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৩৩।

প্রতিবাদী নারী ভাবনায় কবি কৃষ্ণা বসু

রূম্পা ভদ্র

গবেষিকা, বাংলা বিভাগ

রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার

কেহ নাহি দিবে অধিকার

হে বিধাতা?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘সরলা’ (মহুয়া) কবিতায় পাই নারীর তত্কালীন অবস্থান। ধারা বিবর্তনের হাত ধরে সভ্যতার গতি প্রকৃতিটা বদলেছে অনেক। নারীজীবনের বিবর্তন ঘটেছে সমাজ পরিবর্তনের হাত ধরে। অন্তপুরচারিনী নারী আজ স্বীয় গুনে পুরুষের সমকক্ষ। নারী জীবনের এই ইতিহাসটা একদিনে বদলায় নি। বলা ভালো আজও নারী সমাজ, সংসারে চরম অবহেলিত। পুরুষের নির্যাতনের শিকার। শুধু পুরুষ নয়; সমাজ, ধর্ম, সন্সকার মেয়েদের মাথা তুলে দাঁড়াবার পথে অনেক বড় বাঁধা। সমগ্র পৃথিবী জুড়েই চলছে নারীর আত্মমর্যাদার লড়াই। এ লড়াই এর অতীত ইতিহাস অবশ্যই আছে। তবে তাঁর আগেও জড়িয়ে আছে মানবতার ইতিহাস। কারণ আমরা জানি যে দেবদেবী নির্ভর বাংলা সাহিত্য জগত্ থেকে মানবতা কেন্দ্রিক জগতে পদার্পণের জন্য এক দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবকে ঘিরে প্রথম মানবতার জয়স্তুতি রচিত হয়। তার আগে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য শুধুই দেবদেবীর কার্যবিধিতে পরিপুর্ণ। মধ্যযুগের ইতিয়াহসে ষোড়শ শতকে সুবর্ণ্ময় যুগের সূচনা ঘটে চৈতন্যদেবকে ঘিরে। দেবদেবী নির্ভর সাহিত্য জগতে মানবতার জয়গান রচিত হল চৈতন্যদেবকে ঘিরে।

চৈতন্যদেবকে ঘিরে শুধু যে মানবতার জয় ঘোষিত হয়েছে তাই-ই নয়; তাকে ঘিরে রচিত হয়েছে সাহিত্য বাংলার সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতিতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় বধ হয় না বললেই নয়, তা হল সপ্তদশ শতকে দুই কবি যথা দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাও আরকান- রোসাঙ্গের রাজসভার আনুকুল্যে গরে ওঠা ‘লোর চন্দ্রানী’ বা ‘সতী ময়না’ কাব্য। এ কাব্যে ও কোনো দেব দেবীর প্রাধান্য পাওয়া গল্প নয়; মানব মানবীর প্রণয় ভালবাসার কথা বলা হয়েছে এখানে। সপ্তদশ শতকে দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে মানব প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে।

ইতিহাসের পালাবদলের হাত ধরে সাহিত্য ও কলেব্র বর্ধিত হয়েছে। হয়েছে সংযোজন বিয়োজনের পদ্ধতি প্রথা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী সমাজ নতুন করে মানবমুক্তির কথা ভাবতে শুরু করে দীর্ঘ অতীতের সংস্কার-কুসংস্কারে পরিবর্তন হয় এদের হাত ধরে। শিক্ষার প্রসার মানবজীবনে নিয়ে আসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

উনিবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কোম্পানির শাসনকাল চলেছিল। শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোথাও গুরুত্বপূর্ণ উত্থান পতনের ঘটনা না ঘটলেও সমাজ সংক্রান্ত আন্দোলন প্রবলবেগে তরঙ্গিত হয়েছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথা নিষেধ, একেশ্বরবাদ প্রচার, স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা, বিধবাবিবাহ আইন প্রভৃতির প্রচলন কৌলিন্য প্রথা ও বহু বিবাহ বিরোধী আন্দোলন এ যুগের জীবনচর্চাকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। মূলত ইংরেজ শাসনের হাত ধরে বাংলায় শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার নব্য মানবকেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চা, ধর্ম-আন্দোলন প্রভৃতির তরঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলিত হয়েছিল। ফলে যা পুরাতন কাব্যধারার অস্থিমজ্জায় জড়িয়েছিল, তাকে বিসর্জন দেওয়ার বাসনা জাগল বাঙালীর মনে। উনবিংশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কবি মধুসূদনের হাত ধরে নারীমুক্তি, বলাভালো নারী নিজস্ব সত্তার উন্মোচন ঘটেছিল। মধুসূদন দত্তর লেখা ‘মেঘনাদ বধ কাব্যে’(১৮৬১) প্রমীলা ও চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের মধ্যে নারীর আত্মাভিমানের পরিচয় মেলে। রাবণ পত্নী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গিহীন জীবনের একমাত্র অবলম্বন পুত্র বীরবাহু। বীরবাহু যুদ্ধে মারা গেলে স্বামীকে ভৎর্সনা করেছেন রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা। স্বামীকে অনুযোগ করেছেন চিত্রাঙ্গদা-

“একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি

কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে

রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল মনি,

তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি

পাখী। কহ, কথা তুমি রেখেছ তাহারে

লঙ্কানাথ।”

মেঘনাদবধ কাব্যের অপরাপর এক তেজস্বী নারী চরিত্র আপন মহিমায় ভাস্বর। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্য জগতে নারীর আত্মমভরিতা এতো উচ্চকিতায় ঘোষিত হয় নি। বরং বলা ভালো মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পুরুষকারের প্রতিভূ চাঁদসদাগর-যিনি দেবী মনসাকে বাঁহাত দিয়ে পুজো দিয়ে দেবীকেই যেন ধন্য করেছেন। স্ত্রীদেবী মনসা এতেই কৃতার্থ। আর উনবিংশ শতকে মুধুসূদন দত্তের হাতে প্রমীলা চরিত্রের হাত ধরে যেন বাংলা সাহিত্যে নারীমুক্তির জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে প্রমীলা চরিত্রটি মধুসূদনের হাতে অসামান্য রূপলাভ করেছে। ভ্রাতা বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে বিচলিত মেঘনাদ স্ত্রী প্রমীলাকে প্রমোদ উদ্যানে রেখে স্বদেশরক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা করলে প্রমীলা অতন্ত্য কাতর হয়ে পড়ে। প্রমীলা সখী বাসন্তীকে লঙ্কায় প্রবেশের ইচ্ছে জানায়। সখী বাসন্তী প্রমীলাকে বাধাদান করে এবং জানায় যে চারিদিকে শত্রু রামচন্দ্রের সেনায় পরিপূর্ন, কেমন করে ষে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে স্বামী মেঘনাদের সঙ্গে মিলিত হবে। এর উত্তরে প্রমিলার উক্তি-

“কি কহিলি, বাসন্তী? পর্বত-গৃহ ছাড়ি

বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে,

কার হেন সাধ্য যে ষে রোধে তাঁর গতি?”

শুধু তাই নয়, শত্রুপক্ষের অধিপতি রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে তার ঘোষণা-

“রাবণ শ্বশুর মন, মেঘনাদ স্বামী,-

আমি কি ডরাই, সখি ভিখারী রাঘবে।”

নারীর আমিত্ব বোধের প্রকাশ বোধহয় বাংলা সাহিত্যে প্রমিলার হাত ধরেই রচিত হয়েছে। কারণ ইতিপূর্বে এতো আত্মমর্যাদাপূর্ণ নারীর খোঁজ বাংলা সাহিত্যে মেলে না।

উনবিংশ শতকে নারীর ভাগ্য জয়ের প্রথম সোপান রচিত হয়েছে মধুসূদনের হাত ধরে। শুধু তাই নয়, দেবতা রামচন্দ্র তাঁর দেবত্ব মহিমাকে ত্যাগ করে মর্ত্য পৃথিবীতে পা রাখতে বাধ্য হয়েছেন। দেবতা নয় মানুষের মহিমাই ঘোষিত হয়েছে এ কাব্যে। রাবণ ও রাবণ পুত্র মেঘনাদের মানবিকতার জয়ঘোষিত হয়েছে মেঘনাদবধ কাব্যে।

উনবিংশ শতকের শেষভাগে বাংলার সাহিত্য জগতে মহিলাগীতি কবির অনুপ্রবেশ ঘটলো। আসলে উনবিংশ শতক ত একাধারে মানবমুক্তির শতক। মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে মানুশ নিজস্ব আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিজেকে মগ্ন হল। পুরুষের হাত ধরে অন্তপুরচারীণী নারির ঘটল আত্মমুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী কিংবা মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু বাংলা সাহিত্যে মহিলা কবি হিসেবে সুপরিচিত নাম। ঘরোয়া পরিবেশকে কাব্যে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবি কামিনী রায়ের কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। আবার নিজস্ব অনুভূতির সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর সহজ প্রকাশ দেখা যায় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্য-কবিরায়। এরপর আমরা পাই আমাদের বিস্বাকবিকে। রবীন্দ্রনাথের হাতে নারীর সামাজিক অবস্থান ভিন্নমাত্রায় ফুটে উঠেছে। স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর বা অপরিচিতা ছোট গল্পে একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তিত্বের চরম মহিমা স্বীকৃত হয়েছে তেমনি অন্যদিকে নারীর স্বাধীন চেতনাটি বিকশিত হয়েছে।‘চোখের বালি’ উপন্যাসে যে বিনোদীনিকে লেখক রবীন্দ্রনাথ কাশিবাশিনী করতে বাধ্য হয়েছেন তিনিই আবার ‘শেষের কবিতা’য় লাবণ্যকে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন নতুন মাইলস্টোন। নারীকে হেয় নয়; নারীপ্রেমকে শীরোধার্য করেছেন প্রেমিক অমিত।

রবীন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রবলয় থেকে শ্বকীয়তায় ভাস্বর অপর একজন কবি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি একাধারে মানবতাবোধে উন্মুখ একজন কবি। তিনি নারীকে দিয়েছচেন অর্ধেক আকাশের অংশীদার। ‘নারী’ কবিতায় কবির উচ্চকিত ঘোষণা-

“বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর

অর্ধেক তাঁর করিয়াছে নারী, অর্ধেক তাঁর নর।”

তবে এতো সবাই নারীকে ঘিরে পুরুষের কথা। নারী যখন নিজেই তাঁর মুক্তির কতাহ বলে তখন তা ভিন্নমাত্রায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। যেমন আমরা সপ্তদশ শতকের স্বনামধন্য কবি কৃষ্ণা বসুর কাব্য কবিতায় নারীকে দেখি-

“দশ হাতে, দশ প্রহরণ নিয়ে,

সিংহ বিক্রমের উপর পা-দুখানি রেখে

দাঁড়া দেখি মেয়ে।” (দেবীস্ত্রোত্র)

সপ্তদশ শতেকর কবি কৃষ্ণা বসুর পূর্বেও বহু খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকেরা আছেন, যারা তাঁদের রচনার মধ্যে রেখে গেছেন স্বকীয়তা বোধ। রবীন্দ্র-নজরুলের পর বাংলা কাব্যজগতে জীবনানন্দ দাশ ব্যতিক্রমী নাম। তাঁর কাব্য যথা – মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী, বাংলা, বনলতা সেন প্রভৃতি কাব্যে পাওয়া যায় কবির নিজস্ব লেখনী সত্তার বোধ।

রবীন্দ্রনাথ হাজার বছর ডিঙিয়ে বারবার আমাদের কালিদাসের জগতে নিয়ে গেছেন বলেই জীবনানন্দের সঙ্গে হাজার বছর ধরে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অথবা বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগতে বা বিদর্ভ নগরে পথ হাটতে আমরা ক্লান্তি বোধ করি না। উজ্জ্বয়িনীর মালবিকা আর নাটোরের বনলতা যদিও এক কালের বা এক দেশের মানুষ নয়, তবু তাদের চোখে-মুখে-দেহে একই ভাষা, যা পড়তে কষ্ট হয় না –

‘‘বলেছে সে ‘এতদিন কোথায় ছিলেন,

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে

নাটোরের বনলতা সেন।’’

‘বনলতা সেন’ কাব্যের নাম কবিতা বনলতা সেন নামক এ কবিতাটি পড়লে অতি সহজেই মনে হয়, যা সবচেয়ে বেশি পুরাতন, তা-ই বোধহয় সবচেয়ে বেশি আধুনিক।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার যাত্রা শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত রূপের হাত ধরে। আর বাংলা কাব্যে নতুন আধুনিকতার লক্ষণগুলো এসেছে ইউরোপীয় কাব্যকলা মারফত। ইউরোপে ইংরেজি ও ফারসি কাব্য-সাহিত্যে এই আধুনিকতা খুব স্পষ্টভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা দিয়েছিল। সময়ের দিক থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা এবং নতুন সৃষ্টির প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রেত্তোর কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য। নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত, বর্তমান জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব, ইংরেজ কবিদের প্রভাব, প্রথাগত নীতি ধর্মে অবিশ্বাস, গদ্যছন্দের ব্যবহার, বিষয় বৈচিত্র প্রভৃতি রবীন্দ্রত্তোর আধুনিক কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কল্লোল, কালিকলম পত্রিকার হাত ধরে জন্ম নিল রবীন্দ্রত্তোর কাব্য-কবিতার মৌলিক প্রয়াস। রবীন্দ্রোত্তর কবি বুদ্ধদেব বসু ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধে বলেছেন – ‘‘নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশ – এই কুড়ি বছরে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হলো।’’

কবি নজরুল ইসলাম থেকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এই জার্নিএত আরও অনেক খ্যাতিমান কবির অআবির্ভাব ঘটেছে। যথা – অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথের নিকট সান্নিধ্যে থেকেও রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার বাসনা নিয়ে যিনি রবীন্দ্রত্তোর কাব্যধারায় অআবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি হলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। সাহিত্যের অপরিবর্তনীয় বিশিষ্টতার উল্লেখ করে অমিয় চক্রবর্তী লিখেছিলেন – ‘‘সাহিত্যের কাজ অআজও যা কালও তাই ছিল। অর্থাৎ সত্য বলা, সবখানি সত্য বলা।’’

তীব্র কন্ঠে রবীন্দ্র বিরোধিতার বাণী না উচ্চারণ করে রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে অআসতে পেরেছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

অন্যদিকে আধুনিক বাংলা কাব্যের এক অনন্য সাধারণ শিল্পী হলেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সমস্যার ছবি পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যে হুইটম্যানের আবেগধর্মী উচ্ছ্বাস শোনা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র অন্তরে বিশ্বাস করতেন —

‘‘সত্যিকারের কাজ যখন মানুষ করে

তখন মানুষ হয় নব-বসন্তের গাছের মতো

প্রাণের বেগে স্পন্দমান,

মানুষ তখন জীবনকে করে উপভোগ।

শুধু কাজ তো সে করে না।’’

বুদ্ধদেব বসুর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিএজই বলেছিলেন – ‘‘কেবল কবিত্বশক্তি মাত্র নয়, এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েছে, একদিন প্রকাশ পাবে।’’

রবীন্দ্রত্তোর কাব্যধারায় আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যঋদ্ধ ও জীবনধর্মী এবং সমাজমনস্ক কবি হলেন কবি বিষ্ণু দে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের ক্ষতজর্জর মধ্যবিত্ত বাঙালি নাগরিক সমাজের অন্তঃসার শূন্য সমাজের ছবি এঁকেছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রত্তোর বাংলা কবিতার অঙ্গনে ব্যতিক্রমী কবি ব্যক্তিত্ব হলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কমিউনিষ্ট ধারায় বিশ্বাসী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন যে, কমিউনিজমের মাধ্যমে মানুষের মুক্তি অআসেব। পদাতিক কাব্যগ্রন্থে কবির শেষকথা আন্তরিক প্রার্থনার মতো উচ্চারিত হয়েছে —

‘‘আমাকে সৈনিক করো তোমাদের

কুরুক্ষেত্রে, ভাই।’’

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী কবির কাব্যে নারীর সৌন্দর্য ভিন্ন মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। নারীর আপাত বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়; সেই মেয়েটিই কবির কাছে সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়েছে, যে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের কথা প্রচার করে। সকলের মধ্যে বিলি করে ইস্তাহার। সে দেখায় বঞ্চিত মানুষদেরকে সুন্দরভাবে বাঁচার স্বপ্ন। কবির চোখে সেই মেয়েটিই সুন্দর।

‘‘যখন ভোঁ বাজতেই

মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র

একটি করে ইস্তাহারের জন্য

উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল

যখন তোমাকে আর দেখা গেল না

তখনই

আশ্চর্য সুন্দর দেখালো তোমাকে।’’

বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় নারীর সৌন্দর্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে বার বার ভেঙে দিয়েছেন তথাকথিত নারী সৌন্দর্যের আকর্ষণী মায়া।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের প্রতিনিধি স্থানীয় হলেন অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কবি অরুণ মিত্র সমকাল চেতনায় তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে ছিলেন অগ্রগণ্য। অন্যদিকে চল্লিশের দশকের সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে নেতৃত্ব স্থানীয় কবি হলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের তিরিশের দশকে কবিতার বই প্রকাশিত হলেও তাঁকে চল্লিশের দশকের কবি বলে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না। কারণ কবি হরপ্রসাদ মিত্রের স্বাতন্ত্র্য সংবলিত কবিতার প্রকাশ মুখ্যত চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকেই লক্ষিত হয়।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি হলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আধুনিক সভ্যতার নেতিবাচক দিক, রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকের ন্যায়নীতি ভ্রষ্টতা ও শোষণ, পীড়ন, বুদ্ধিজীবীদের স্তাবকতা ও বিবেকহীন ইত্যাদি তাঁর কবিতায় চিত্রিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা ভালো দেশ স্বাধীনের ঘটনা, পাকিস্থান নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম, পরবর্তীএত বাংলাদেশ নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি – ইত্যাদি ঘটনা কাব্য সাহিত্য জগতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই সময়ের কিবতার বিশেষত্ব হল —

এক) কমিউনিষ্ট দর্শনে অতিমাত্রায় আস্থাস্থাপন, দুই) কবিতার আঙ্গিক নিয়ে নানানতর পরীক্ষা নিরীক্ষা, তিন) অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ-বেদনা ও হতাশার চালচিত্র, এবং চার) নবযুগের প্রত্যাশা ও ব্যক্তিগত অনুভূতির নিবিড় প্রকাশ। এ যুগের এক উল্লেখযোগ্য কবি ব্যক্তিত্ব হলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। ষাটের দশকের এই কবির রচনাতে ফুটে উঠেছে সমাজ সচেতনতার পরিচয়। সংবেদনশীল কবি একাধারে যেমন মানুষের কথা বলেছেন তাঁর রচনায়; তেমনি অন্য দিকে সমকালীন সমাজ জীবনেরও বাস্তব পরিচয় মেলে শঙ্খ ঘোষের কবিতায়।

পঞ্চাশের দশকে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে কবির গভীর একাকীত্বের কথা। অন্যদিকে এই দশকেরই কবি বিনয় মজুমদাএরর কবিতায় পাওয়া যায় অআদিরসের গাঢ় গভীর চর্চা। পঞ্চাশের দশকের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন জীবনচর্চায় বিতর্কিত কবি ব্যক্তিত্ব। তবে ষাট ও সত্তরের দশকে তার প্রতিভার যথার্থ স্ফূরণ ঘটেছিল।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় না বললেই নয়, তা হল ষাটের দশকের হাংরি জেনারেশনের কাব্য আন্দোলনের কথা। কবিতাকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করতে গিয়ে হাংরি কবিরা নিজ নিজ জীবন চর্চার পাশাপাশি কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচেনর ক্ষেত্রেও প্রথাসিদ্ধ বিষয়বস্তুকে বাদ দিএয় অআপাত ভালোলাগাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বিশৃঙ্খল সমাজ পরিস্থিতিতে, অসহনীয় রাজনৈতিক পরিবেশে এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক সে সময় নিজেদের মতো করে কাব্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সমীর রারচৌধুরী, মলয় রায়, চৌধুরী, তুষার রায়, শৈলেশ্বর ঘোষ, শম্ভু রক্ষিত, অরণি বসু প্রমুখ কবিরা হাংরি আন্দোলনের শরিক হন।

হাংরি আন্দোলনের পর আরও একটি আন্দোলনের জন্ম হয়। তার নাম শ্রুতি অআন্দোলন। শ্রুতি কবিরা কবিতার দুটি দিকের প্রতি লক্ষ্য দেন। এক) কবিতার শ্রব্যরূপ, দুই) দৃশ্যরূপ। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে বর্ণনার অনুপম ক্ষমতায় কবিতায় যে চিত্ররূপ ফুটে ওঠে, সে রূপ শ্রুতি কবিতার নয়। এ ধরনের কবিতায় শব্দ সাজানোর কৌশলেই গড়ে ওঠে চিত্ররূপের হাত ধরে। এ রূপ দৃষ্টিগ্রাহ্যও বটে। শ্রুতি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন রত্নেশ্বর হাজরা, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, পুষ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও অনেক কবি।

সত্তরের দশকে এসে বাংলা কাব্য জগতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা যথা – মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলার বিশেষ অঞ্চলের ভাষায় কবিতা রচিত হয়েছে। আবৃত্তিকারদেরও কন্ঠে বাংলা কবিতা দেশ বিদেশের কবিতা পাঠককে তৃপ্তি দিয়েছে। এই সময়ের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল – ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ, প্রাচীন পুরাণ ও উপনিষদের কাহিনী, ও চরিত্রের পুণর্বিচার, রোমান্টিকতার প্রতি আকর্ষণ, পদ্য কবিতার মোহপাশ ছিন্ন করে বিচিত্র মিলযুক্ত ছন্দের পরীক্ষা –নিরীক্ষা প্রভৃতি। এই সময়ের প্রথিতযশা কবি হলেন – কবি কৃষ্ণা বসু। সমসাময়িক অন্যান্য কবি ব্যক্তিত্ব যথা – অজিত বাইরী, শামসুর রহমান, রমা ঘোষ, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর চট্টোপাধ্যায়, রমেন আচার্য, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, অনিল সরকার, শ্যামলকান্তি দাস এছাড়াও বহু কবির সন্ধান মেলে এই দশকে।

সাম্প্রতিককালের কবিতাচর্চা ধারায় কৃষ্ণা বসু (জন্ম ১৯৪৭) নিজ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭৬-এ। তিনি সত্তরের দশকের কবি বলে চিহ্নিত হলেও ছয়ের দশকেই তাঁর মধ্যে কবি চেতনার উন্মেষ ঘটে। সত্তরের দশকের দিকে যদি আমরা ফিরে যাই, তাহলে দেখবো – এই দশকে পশ্চিমবঙ্গে রাজৈনতিক অস্থিরতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। পুলিশি অত্যাচার অব্যাহত। নকশাল আন্দোলনের তীব্র রূপ, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ইত্যাদি। এই দশকেরই ৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন। পুলিশের নির্মম দমন নীতিতে নকশাল পন্থীরা বিপর্য্ত হন এবং পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা এবং এই দশকের শেষের দিকে নকশাল আন্দোলন ক্রমশ স্তব্ধ হতে থাকে।

রাজনৈতিক টানাপোড়েন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা আর সামাজিক অস্থিরতার জনজীবন হয়েছে বিপন্ন। সমকালীন ভাবনায় ভাবিত অন্যান্য কবিদের পাশাপাশি কবি কৃষ্ণা বসু খুঁজে পেলেন নিজস্ব সত্তা এবং তা অবশ্যই নারীবাদী ভাবনা-চিন্তার অঙ্গনে। এক ভালোলাগার অদম্য অনুভূতি কবিকে করেছিল অভিভূত অআর তারই অভিঘাতে উৎসারিত হয়েছে কবির কাব্য জগত। মেয়েদের দেখেছেন গভীর সহমর্মিতায়। তাই সাক্ষাৎকারে কবি অবলীলায় বলতে পারেন —

‘‘বানিয়ে লেখায় বিশ্বাস করি না।

লেখা ভেতর থেকে উৎসারিত হয়।’’

কবি মেয়েদের জীবন সমস্যা, যন্ত্রণা, বাধ্যবাধকতা, সংস্কার অআর নিপীড়ন নিয়ে কথা বলে আসলে শেকল ভাঙার ও তার সৃজন স্বপ্নে মগ্ন হতে সাহায্য করতে চেয়েছেন তাঁর মতো করে। মেয়েদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন কবি।

কবির হাতের ছোঁয়ায় ফুলের ছবি, নারীর ছবি কাব্য সৌন্দর্য্য মহিমায় উদ্ভাসিত হলেও কৃষ্ণা বসু স্বতন্ত্র ভাবনায় ভাবিত কবি অতি সহজেই বলতে পারেন —

‘‘একটু সরে এসে

জীবন নামের কঠিন রাজ্যে পাশে দাঁড়াও হেসে।’’

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম যথা – ‘শব্দের শরীর’ (১৯৭৬), ‘জলের সারল্যে’ (১৯৮২), ‘কার্ডিগানে কুসুম প্রস্তাব’ (১৯৭৬) ‘নার্সিসাস ফুটে আছে, একা’ (১৯৮৮), ‘জলে বাতাসে অন্ধকারে’, ‘অন্যমনস্ক বাতাস ও খোলা পাতা’, ‘সাহসিনী কে রয়েছ সাজো’, ‘ছন্দ ও গদ্য ভরা কবিতার ডালি’ (২০১৩) ইত্যাদি কাব্য কবিতায় কবির সমাজ সচেতনতা এবং সময় সচেতনতার পরিচয় মেলে। তাই অতি সহজেই তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে স্বার্থবোধ, ঈর্ষা, অতৃপ্তি, মুগ্ধতা ও কামনা-বাসনার ভাষা। তাঁর কাব্য জগতে যন্ত্রণা থাকলেও সৌন্দর্যেরও অভাব নেই। তাই রিক্ততার পাশে বেড়ে ওঠে শূন্যতার গল্প – ‘‘নারী তাকে এইসব গল্প বলে, / বাতাস বহন করে শীত, আঘ্রাণের শীত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাশের গ্রামে নবান্নের খবর আসে।’’ (নবান্ন ও ফাঁকা মাঠ)

মিথ্যে বা মেকি বিষেয়র প্রতি কবির আছে সদা সংগ্রাম, কোনো আপোষ নেই সেখানে। অথচ কবির কী-ই বা করার থাকে, বিস্ময় অনুযোগ, প্রশ্ন করা ছাড়া। প্রশ্নচিহ্ন কবির জিজ্ঞাসা —

‘‘এবং দরজা খুলে বেরোলেই সেই মিথ্যাগুলি,

আমাদের সব সত্য মুহূর্তগুলিকে খেয়ে ফেলে।’’

নারীজীবনের চরম সত্যতার পরিচয় খুঁজতে গিএয় কবি খোঁজ পেয়েছেন বলাভালো পাঠককে দিয়েছেন মেয়ে মানুষের লাশের ঠিকানা। ‘মেয়ে মানুষের লাশ’ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতা কবিরও বড়ো প্রিয় –

‘‘সাঁকের কিনারে এসে অআটকে আছে লাশ,

মেয়ে মানুষের লাশ,’’

সেই মেয়েটির মুখ ফেরানো আছে -

‘‘..... সন্তানের দিকে,

তার মুখ ফেরানো আছে সংসারের দিকে,

তার মুখ ফেরানো আছে পুরুষের দিকে।’’

এই কবিতার মধ্যে মেয়েদের জীবনের অসহায় রূপটিকে তুলে ধরেছেন কবি।

কবিকে নারীবাদী তকমা দিয়েছে সমাজ, বলাভালো পাঠককুলও দিয়েছেন। তবে কবির এ বিষয়ে নিজস্ব অভিমত – তিনি অবশ্যই নারীজীবন যন্ত্রণায় ভাবিত কবি, তাই তাকে যদি নারীবাদী কবি বলা হয়, অত্যুক্তি হবে না। তবে সেইসঙ্গে কবি এটাও বলেছেন যে তিনি সমাজ সচেতক কবিও বটে।

কবি কৃষ্ণা বসুর ‘অন্নব্র’ কবিতাটি পড়লেই একথার সত্যতা অতি সহজেই প্রমানিত হয় –

‘‘সাদা ভাত, যুঁই ফুল সাদা ভাত, ঘরে ঘরে –

ফুটে ওঠা ঝাঁ ঝাঁ

খিদের সময় ...

আহা ভাত, আহা

লক্ষ্মী, কে তোমাকে অস্থির চঞ্চলা বলে?

শিশুর হাসির মতো

ঘরে ঘরে ওঠো মাটির সানকিতে

আর এনামেল পাত্র

জুড়ে ...।’’

দরদী মনের এতো সুকোমল পরিচয় আমরা খুব কমই পাই।

সত্তরের দশকের কবিদের কবিতায় অতীতচারিতার দিকটি বারবার ফুটে উঠেছে। অতীত ঐতিহ্যের পুণঃসংস্করণ ঘটেছে কবি কৃষ্ণা বসুর হাতেও। কবির চোখে ধরা পড়েছে মধ্যযুগীয় নারী রাধার দুর্দশার কথা। ভগবান কৃষ্ণের প্রেমশক্তির আধার রাধা, সেই নরীকেও হতে হয়েছে নিপীড়নের শিকার। রাধা একমুখী ভালোবাসায় উজার করে দিয়েছেন নিজেকে। পুরুষ কষ্ণকে প্রতারক হিসেবে মেলে ধরতেও পিছপা হননি কবি। তাই অতি সহজেই কবি বলেত পারেন –

‘কানু, ভুল কানু, ভুল নায়কের জন্য তোর সত্য কান্না।

(রাধিকা সংবাদ)

কবি কৃষ্ণা বসু একজন আদ্যন্ত ভলোমানুষ, নিষ্ঠাবান কবি। তিনি নিজেই কবিতা সম্পর্কে বলেছেন – ‘বাংলা ভাষার সবচেয়ে ঋদ্ধিমান শাখাটি হল কবিতা।’ কবি জীবনের গভীর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ যদি হয় কবিতা, তাহলে অতি সহজেই বলা যায় যে, কবিতার বাহ্যঅবয়ব সৌন্দর্যের মূল চাবিকাঠি হল ছন্দ। কৃষ্ণা বসু সবরকমের ছন্দ যেমন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত কিংবা গদ্যছন্দ সবতেই সাবলীল। এ প্রসঙ্গে কবির নিজস্ব অভিমত – ‘ছন্দের কান তৈরি করার জন্য ছন্দের কবিতা পড়া ও শোনা দরকার।’ ‘জলেই বাড়ি ঘর’ কবিতার ছন্দ আমাদের শ্রুতিযন্ত্রের ভালোলাগার অনুভূতিকে ঠিক এভাবেই জাগিয়ে তোলে —

‘‘ফেটে পড়ে ফেটে পড়ে জলস্তম্ভ মস্ত

অস্তিত্বই সুখের বাণে এমন বিপর্যস্ত।’’

কিংবা অন্তমিল যুক্ত এক কবিতার আবেদনও অনবদ্য –

‘‘দুষ্ট করবে, ধ্বংস করবে সভ্য বিকিকিনি,

দু চার মুষ্টি না পেলে ঐ নাছোড় ভিখারিনী।’’

কৃষ্ণা বসুর কবিতার যদি সাগ্রিক মূল্যায়ন করি তাহলে অআমরা বেশ কয়েকটি বিষয় খুঁজে পাই –

সাবলীল অনুপ্রাসের ব্যবহার, উপমার ক্ষেত্রে ধ্রুপদী ঘরানার বারবার পৌরাণিক ও লোকসাহিত্যের উৎসমুখে সহজ বিচরণ তাঁর কবিতায় লক্ষণীয়। রোমান্টিক অতীত ইতিহাসের সঙ্গে, তুলনামূলক অসাধারণ উপমার ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে চিত্রকল্পের অসাধারণত্ব – কবিএক দিয়েছে চিরকালীন স্থায়িত্বের দাবীদার। পৌরাণিক নায়িকা রাধিকার উপেক্ষার জীবনদৃষ্টি – যার মধ্য ইদেয় পরিচয় মেলে কবির সহমর্মিতা ও সহানুভূতি বোধ এবং তা অবশ্যই মেয়েজীবনকে ঘিরে।

অতীত ও বর্তমানের অসাধারণ মেলবন্ধনের পরিচয় মেলে তার কবিতায়। কোথাও অতি সহজেই প্রবেশ করেছেন কবিতার বিষয়বস্তুতে, আবার কোথাও চিত্রকল্প বিমুর্ততার আবহ রচনা কের সৃষ্টি করেন ‘মিষ্টিক’ অনুভূতি। তিনি শিখিয়েছেন মেয়েদের শিরদাঁড়া সোজা করে মাথা উঁচু করে মানুষের মতো বাঁচতে। তাই কবি অতি সহজেই বলতে পারেন —

‘‘দশ হাতে, দশ প্রহরণ নিয়ে,

সিংহবিক্রমের উপর পা-দুখানি রেখে

দাঁড়া দেখি মেয়ে।’’

(দেবীস্তোত্র)

আর এভাবেই পরিচয় মেলে গভীর গহন মনের খোঁজ। নির্দিদ্বায় কবি বলে ওঠেন – ‘হ্যাঁ আমি নারীবাদী। নারীবাদীই হলো মানবতাবাদের গোড়ার কথা।’

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক বাংলা কাব্য জগতে কবি কৃষ্ণা বসুর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে অনেক পত্র পত্রিকায় কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তবে তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা ভালো চিত্তাকর্ষকও বটে। কারণ সত্তর দশক থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে নারীদের যে সমস্যা রয়েছে যথা – পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয় তাঁর কবিতায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছে। আরও অনেক কাব্য –কবিতায় নারীর জীবনের নানান সমস্যার কথা ফুটে উঠলেও কৃষ্ণা বসুর মতো এতো বৃহৎ পরিসরে মেয়েদের কথা ইতিপূর্বে ভাবেন নি কেউই । অথচ বিষয়টি শুধু সাহিত্যিক দিক থেকেই নয়, সমাজতাত্ত্বিক দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – সুকুমার সেন।

২) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস – ক্ষেত্র গুপ্ত।

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) – শ্রী দেবেশ কুমার আচার্য্য।

৪) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় – দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৫) মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প – ক্ষেত্র গুপ্ত।

৬) মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদবধ কাব্য – সম্পাদক ডঃ জীবেন্দু রায়।

৭) সঞ্চিতা – কাজী নজরুল ইসলাম।

৮) সঞ্চয়িতা – রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

৯) জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র – সম্পাদক ক্ষেত্র গুপ্ত।

১০) কবি কৃষ্ণা বসুর কবিতার আকাশ – মন্টু মিত্র।

১১) শ্রেষ্ঠ কবিতা – কবি কৃষ্ণা বসু।

১২) কবি কৃষ্ণা বসু জেগে অআছে সাহসিননী – তরুণ মুখোপাধ্যায়।

১৩) ছন্দ ও গদ্য ভরা কবিতার ডালি – কবি কৃষ্ণা বসু।

১৪) কথাকৃতি (প্রসঙ্গঃ কৃষ্ণা বসু) – সম্পাদক নীলাদ্রিশেখর সরকার।

১৫) আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা – ডঃ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়।

# Le thème, l’histoire, les personnages et la forme des quatre romans de François Mauriac

**Dr.Bratish Sarkar** Asstt.Professor, Amity University, Lucknow Secretary North India-IATF

François Mauriac était un grand écrivain français du XXe siècle, membre de l’Académie française et lauréat du Grand Prix du roman de l’Académie française (1926) et du Prix Nobel (1952). Il est toujours très populaire en France, mais malheureusement il n’est pas vraiment connu en République tchèque. Pourtant, son œuvre est encore aujourd’hui d’une grande actualité. C’est avant tout grâce à une psychologie des personnages très profondément développée. Mauriac analyse leurs sentiments, traits de caractère, réflexions et comportements d’une manière très vraisemblable qui nous permet de découvrir les recoins cachés de l’âme humaine, de mieux nous connaître nous-mêmes et de mieux comprendre les autres. À cette psychologie impressionnante s’ajoute la critique de la religion, qui est peut-être un peu moins actuelle à l’époque contemporaine, au moins en République tchèque où le pourcentage des pratiquants est peu élevé. Le plus important est la critique sociale dont une grande partie est encore valable de nos jours. Mauriac y montre que la société attache trop d’importance aux valeurs matérielles comme l’argent, la propriété, la réputation et oublie les valeurs spirituelles. Cela détruit la santé psychique des personnages ainsi que les relations entre eux et les empêche aussi d’être libres d’esprit.

C’est alors ce phénomène que nous avons choisi comme sujet de notre travail. En lisant les romans de Mauriac nous nous sommes aperçus que chacun des personnages a ses propres dépendances, plus ou moins fortes, bien sûr, mais qu’aucun d’eux n’est absolument libre. Notre but sera donc dans un premier temps d’analyser brièvement la problématique de la liberté et de la dépendance pour comprendre ce que signifient ces mots et comment ils peuvent être conçus, puis d’analyser le caractère de chacun des personnages, de découvrir leurs dépendances et d’essayer de retrouver leurs causes et leurs conséquences. Enfin nous tenterons d’imaginer des solutions possibles pour qu’ils deviennent plus libres.

Nous allons travailler avec les quatre romans suivants : *Le Désert de l’amour* (1925), *Thérèse Desqueyroux* (1927), *Le Noeud de Vipères* (1932) et *Les Chemins de la mer* (1939) (nous pouvons remarquer que les quatre ont été écrits entre 1925 et 1939, donc durant l’époque de l’entre-deux-guerres).

Pour commencer nous allons mettre en évidence les thèmes et les motifs communs aux quatre romans. Puis nous résumerons l’histoire, présenterons les personnages et analyserons la forme de chacun d’eux.

Dans cette partie nous allons d’abord présenter les thèmes et motifs généraux, communs à tous ses romans, et puis éclaircir le thème, l’histoire, les personnages et la forme de chacun d’entre eux.

## Les thèmes et motifs communs aux quatre romans

Les quatre romans se déroulent dans un milieu bourgeois dans les Landes, région autour de Bordeaux, d’où venait l’auteur. Il y développe plusieurs grands thèmes. D’abord nous allons mentionner la critique de la société. Les personnages sont souvent limités par les règles de la société, qui leur impose leur manière de vivre. Ils sont eux-mêmes trop faibles pour y résister et dans la plupart des cas ils ne souhaitent même pas résister, ils se plaisent dans leurs stéréotypes, ils aiment leur vie déjà planifiée et prédéterminée. Nous pouvons néanmoins en distinguer quelques-uns qui souffrent de cette dictature, qui veulent vivre différemment et plus librement. Malheureusement, ce désir leur coûte l’incompréhension et parfois même le refus de leur entourage.

Dans *Le Noeud de Vipères* s’ajoute la critique de la religion, où plutôt de la façon dont elle est pratiquée. Il fait un reproche aux catholiques qui, souvent, ne font que remplir seulement leurs devoirs mais manquent d’une véritable foi. Sur le personnage principal, il nous montre qu’une personne que tout le monde prend comme un monstre et qui soutient elle-même être un athée peut avoir plus de foi que tous ceux qui font régulièrement leurs prières et qui vont à l’église chaque matin. Cette personne y réfléchit librement et cherche un sens plus profond, tandis que les autres sont superficiels, font ce qui leur est imposé de faire et puis se font d’eux-mêmes une image fausse qu’ils sont meilleurs.

Un autre thème important est l’analyse psychologique, le voyage dans les profondeurs des âmes. Nous nous apercevons que chaque personne porte en elle tout un monde, tout un univers, où vivent des sentiments, des désirs, des complexes, des réflexions différentes. Cela est étroitement lié avec une autre problématique développée par Mauriac, à savoir les relations entre les gens. La communication est souvent insuffisante entre eux, ce qui amène à l’incompréhension et provoque ensuite des pensées et des émotions négatives comme les préjugés et les soupçons, la jalousie ou la haine. Parfois ils se rendent compte de ce manque de communication et souhaitent même le changer, mais ils ne sont pas capables de casser cette barrière, souvent parce qu’ils ne savent pas ce qui se cache à l’intérieur de l’autre et parce qu’il ont peur de sa réaction. Il s’agit alors d’une situation paradoxale, car seule la communication pourrait permettre de connaître l’âme et de se débarrasser de cette peur. Nous trouverons dans les quatre romans le motif du silence et de la solitude qui accompagne ce manque de communication qui existe entre les maris et les femmes, entre les parents et leurs enfants, et même entre les inconnus. Une autre caractéristique de ce phénomène est l’hypocrisie, c'est-à-dire que les personnages ne communiquent pas franchement, manipulent les autres, mentent. Ils le font soit consciemment, ce qui est le pire, pour atteindre un objectif, soit inconsciemment, parce qu’ils ne se connaissent pas eux-mêmes.

Mis à part la psychologie et la critique sociale, Mauriac maîtrise aussi très bien les descriptions de la nature, parfois romantiques, parfois tristes ou même dépressives, mais toujours touchantes, et sait exprimer la symbiose de la nature avec la vie de l’homme : « La pleine lune se levait à l’est. La jeune femme admirait les longues ombres obliques des charmes sur l’herbe. Les maisons des paysans recevaient la clarté sur leurs faces closes. Les chiens aboyaient. Elle me demanda si c’était la lune qui rendait les arbres immobiles. Elle me dit que tout était créé, dans une nuit pareille, pour le tourment des isolés. » (*Œuvres romanesques*, 549).

Dans tous ces romans nous remarquerons aussi très souvent le motif de la fenêtre, qui est souvent lié à la description de la nature et à une humeur contemplative du personnage qui regarde à travers elle. « Thérèse demeurait débout devant la fenêtre; elle voyait un peu de gravier blanc, sentait les chrysanthèmes qu’un grillage défend contre les troupeaux. Au-delà, une masse noire de chênes cachait les pins ; mais leur odeur résineuse remplissait la nuit ; pareils à l’armée ennemie, invisible, mais toute proche, Thérèse savait qu’ils cernaient la maison. Ces gardiens, dont elle écoute la plainte sourde, la verraient languir au long des hivers, haleter durant les jours torrides; ils seraient les témoins de cet étouffement lent. Elle referme la fenêtre et s’approche de Bernard. » (*Œuvres romanesques*, 339). Ce motif symbolise aussi une possibilité d’évasion d’une prison, une délibération. « Elle se lève, pieds nus ; ouvre la fenêtre ; les ténèbres ne sont pas froides. Mais comment imaginer qu’il puisse un jour ne pas pleuvoir ? Il pleuvra jusqu’à la fin du monde. Si elle avait de l’argent, elle se sauverait à Paris […]. (*Œuvres romanesques*, 347). Finalement, chez les deux femmes, Thérèse Desqueyroux et Maria Cross, ce regard à travers une fenêtre suscite des réflexions sur la mort. Thérèse avait durant ce moment déjà prémédité son suicide. « La fenêtre était ouverte ; les coqs semblaient déchirer le brouillard dont les pins retenaient entre leur branches des lambeaux diaphanes. Campagne trempée d’aurore. Comment renoncer à tant de lumière ? Qu’est-ce que la mort ? On ne sait pas ce qu’est la mort. Thérèse n’est pas assuré du néant. » (*Œuvres romanesques*, 343). En ce qui concerne Maria, l’idée de suicide lui est venue justement au moment où elle regardait par la fenêtre dan le jardin. « Le corps penché dans la nuit, attiré, comme aspiré par la tristesse végétale, Maria Cross cédait moins au désir de boire à ce fleuve d’air encombré de branches qu’à la tentation de se perdre en lui, de se dissoudre – pour qu’enfin son désert intérieur se confondit avec celui de l’espace – pour que ce silence en elle ne fut plus différent de celui des sphères. » (*Œuvres romanesques*, 248).

Un autre motif important qui est souvent lié avec le regard par une fenêtre est la météo. Mauriac en parle souvent, évoque à chaque fois le temps qu’il faisait pendant que les gens discutaient, mangeaient ou réfléchissaient. Il nous montre ainsi combien cet aspect de la nature joue sur l’humeur de l’homme. En lisant ses romans nous avons l’impression qu’à Bordeaux il pleut presque tout le temps. Et quand il pleut les gens sont déprimés, languissants, pensifs. Par contre, quand il fait trop chaud, ils sont angoissés par la peur de l’incendie. La nature sait néanmoins aussi être gentille, et alors elle offre aux personnages des soirées et des nuits claires et romantiques faites pour se balader, se rapprocher, s’unir. Et enfin un grand soleil après une longue période de pluie apporte un nouvel espoir. « Au soleil du matin, le corps détendu, elle s’étonna de ce qu’elle avait souffert. Quelle était cette folie ? Pourquoi tourner tout au pire ? » (*Œuvres romanesques*, 240).

## Le désert de l’amour

Le premier, selon l’ordre chronologique, est le roman *Le Désert de l’amour*, pour lequel Mauriac a obtenu le Grand Prix du roman de l’Académie française. Les motifs principaux en sont la passion entre l’homme et femme, le manque de communication et d’intérêt envers les autres (d’où le titre), l’obsession de la vengeance, la rêverie, la déception et la solitude. C’est néanmoins le seul des quatre romans où nous ne trouvons presque pas le motif de l’argent. L’histoire est centrée autour de trois personnages : Raymond Courrèges, son père le docteur Courrèges et Maria Cross, une femme de réputation douteuse dont ils sont tous les deux amoureux, sans jamais se l’avouer l’un à l’autre. Le roman est écrit en à la troisième personne et divisé en douze chapitres, chronologiques à l’exception du premier. Il s’ouvre par une scène dans un bar parisien où nous rencontrons Raymond Courrèges, un homme d’une trentaine d’années, qui a beaucoup de succès chez les femmes mais qui porte en lui depuis longtemps une blessure qu’une femme lui a fait quand il était adolescent. Depuis 17 ans il souhaite la rencontrer et se venger. C’est dans ce bar qu’il sort de la poche un papier avec un message de son père : il est à Paris et il souhaite le voir. C’est également dans ce même bar qu’il revoit de nouveau cette femme dont il souhaite se venger, Maria Cross. Quand elle entre avec son mari Victor Larousselle, nous commençons à découvrir toute l’histoire depuis l’enfance de Raymond. C’était un enfant différent des autres, il était sale, dépressif, avec peu d’assurance. Entre les membres de sa famille il y avait un manque de communication, un « désert de l’amour ». Raymond voyageait chaque matin avec son père dans son coupé, mais il y avait entre eux toujours un silence. Son père souhaitait trouver un chemin vers son fils, communiquer avec lui, mais il n’y arrivait pas. « Trois quarts d’heure dans cette boite puant le vieux cuir, entre deux vitres ruisselantes, ils demeuraient côte à côte. Le clinicien, qui, quelques instants plus tard, parlerait d’abondance, avec l’autorité, à son service et aux étudiants, cherchait en vain le mot qui atteindrait cet être sorti de lui. Comment se frayer une route jusqu'à ce cœur hérissé de défenses ? Quand il se flattait d’avoir trouvé le joint et qu’il adressait à Raymond des paroles longtemps méditées, il ne se reconnaissait pas, et sa voix même le trahissait – malgré lui ricanante et sèche. Toujours ce fut son martyre de ne rien pouvoir exprimer de ses sentiments. » (*Œuvres romanesques*, 175). La communication est problématique non seulement entre le docteur et son fils, mais aussi entre le docteur et sa femme Lucie. Elle a un caractère franc, elle dit souvent ce qu’elle pense sans réfléchir aux conséquences. Ainsi elle blesse souvent son mari sans le vouloir et après elle le regrette. « Après une scène comme celle de la veille, elle rôdait autour de son mari, cherchant à rentrer en grâce. La pauvre femme découvrait toujours trop tard que ses paroles étaient à coup sûr les mieux faites pour froisser le docteur. Comme dans certains rêves odieux, chaque effort vers son mari l’éloignait de lui […]. » (*Œuvres romanesques*, 179). Le docteur l’aimait pourtant et il avait mauvaise conscience de la tromper dans son esprit avec une autre femme.

Plus tard Raymond fait connaissance avec Maria Cross et cette rencontre le change totalement. C’est pour elle qu’il a commencé à soigner son corps et qu’il est devenu vraiment beau. Il était passionné par elle et ce sentiment était au début réciproque. Elle imaginait en lui un enfant pur, un ange. Mais plus tard, quand il a voulu la posséder, elle l’a refusé et ainsi humilié pour toujours, ce qui a éveillé en lui l’obsession de vengeance. Son père, le docteur Paul Courrèges, était lui aussi amoureux de Maria qui le respectait et l’admirait mais qui s’ennuyait avec lui, sans pouvoir le lui dire. Elle était en tout cas la femme fatale pour les deux et finalement elle était aussi le seul sujet commun qui a permis une communication entre eux, même si celle-ci n’était jamais vraiment franche. Ni l’un ni l’autre ne voulait avouer ses sentiments réels, mais ils avaient tous les deux envie de parler d’elle « Le père et le fils avaient envie de causer. Une force, à leur insu, les rapprochait comme s’ils eussent détenu le même secret […] Comme deux papillons, séparés par des lieues, se rejoignent sur la boite où est enfermée la femelle plein d’odeur, eux aussi avaient suivi les routes convergentes de leurs désirs et se posaient côte à côte sur Maria Cross invisible. » (*Œuvres romanesques*, 222). Pour les deux c’est alors une passion sans espoir. Le docteur cherche la consolation dans son travail et dans sa volonté d’aider les gens, Raymond la trouve chez d’autres femmes, mais rien ne le satisfait vraiment, parce que la blessure causée par Maria persiste. Des passages vus par Raymond, ceux vus par son père et ceux vus par Maria Cross alternent. Ils sont riches en monologues, souvenirs, réflexions et rêves, entrecoupés de dialogues. Dans le 12e chapitre nous nous retrouvons de nouveau dans ce bar parisien. Raymond, le docteur Courrèges et Maria se rencontrent. Les deux hommes ressentaient toujours une passion pour elle, mais elle restait indifférente. Ils se quittent après, et nous comprenons comment les mêmes événements peuvent avoir des significations différentes pour chaque individu. Le docteur Courrèges repart ensuite à Bordeaux et il ne revoie plus jamais Raymond. Raymond réfléchit encore : « Il n’avait jamais songé à ses vertus qui sortent de nous, travaillent souvent à notre insu et à de grandes distances, d’autres cœurs. Au long de ce trottoir, entre les Tuileries et la Seine, la douleur pour la première fois l’obligea d’arrêter ses pensées sur ces choses à quoi il n’avait jamais réfléchi. Sans doute, parce qu’au seuil de ce jour, il se sent démuni d’ambitions, de projets, de jeux, rien ne le détourne de sa vie révolue ; n’ayant plus d’avenir, soudain tout son passé fourmille : que de créatures à qui son approche fut fatale ! » (*Œuvres romanesques*, 276). Il se rend compte maintenant que de même que Maria Cross lui était fatale, beaucoup de femmes ont souffert à cause de lui.

## Thérèse Desqueyroux

*Le Désert de l’amour* a été suivi en 1927 par le roman *Thérèse Desqueyroux*. C’est le seul qui a été adapté au cinéma, en 1962, par George Franju. Les motifs de ce roman sont la solitude, le désespoir et finalement le crime d’une femme incomprise par son entourage, l’aveuglement des gens par les traditions, les stéréotypes, les préjugés et par l’argent, ainsi que le sentiment d’être emprisonné et le besoin de se libérer. Nous y trouvons souvent le motif de la fenêtre qui symbolise la libération, la possibilité de s’échapper (voir plus haut dans la partie concernant les thèmes et motifs communs).

Pour écrire cette œuvre l’auteur s’était inspiré de l’histoire réelle de Blanche Canaby, une bordelaise qui avait essayé d’empoisonner son mari. Le personnage principal est Thérèse Desqueyroux, qui est le personnage le plus chéri par l’auteur et qui apparaît dans d’autres œuvres (Thérèse chez le docteur, Thérèse à l’hôtel, La fin de la nuit). D’autres personnages importants sont entre autres son père Jérôme Larroque, qui est le maire de la ville, son mari Bernard, la sœur de Bernard et l’amie de Thérèse, Anne de la Trave, ainsi que le jeune libertin Jean Azévédo.

Le roman commence par une citation de *Mademoiselle Bistouri* de Baudelaire : « Seigneur ayez pitié, ayez pitié des fous et des folles! O Créateur! peut-il exister des monstres aux yeux de Celui-là seul qui sait pourquoi ils existent, comment ils se sont faits et comment ils auraient pu ne pas se faire… » (*Œuvres romanesques*, 281). Suit une page où il s’adresse à Thérèse : « Thérèse, beaucoup diront que tu n’existes pas. Mais je sais que tu existes, moi qui depuis des années, t’épie et souvent t’arrête au passage, te démasque […] Beaucoup s’étonneront que j’aie pu imaginer une créature plus odieuse encore que tous mes autres héros. Saurais-je jamais rien dire des êtres ruisselants de vertu et qui ont le cœur sur la main ? « Les cœurs sur la main » n’ont pas d’histoire ; mais je connais celle des cœurs enfouis et tout mêlés à un corps de boue. » (*Œuvres romanesques*, 283). Mauriac exprime ici son intérêt envers les personnages complexes, avec leurs défauts humains, son admiration pour les personnages qui doivent lutter à l’intérieur d’eux-mêmes.

Le livre est divisé en treize chapitres. Nous pouvons remarquer qu’il y a deux narrateurs : le premier est un narrateur omniprésent et tout savant, qui n’apparaît pas dans le roman, le deuxième est Thérèse elle-même, qui reconstitue ses souvenirs ou songe à son avenir. Ses propos, qui ont la forme de monologues internes, sont présentés entre parenthèses. L’histoire commence au moment où Thérèse sort du Palais de Justice. Un non-lieu a été prononcé concernant son crime qui était une tentative d’empoisonner son mari. L’affaire a en fait été camouflée, son mari Bernard ayant à la fin témoigné en sa faveur et tout a été présenté comme une inadvertance. Tout cela dans le but de protéger la réputation de la famille et la carrière de Jérôme Larroque. « Ce qu’il appelle l’honneur du nom est sauf ; d’ici les élections sénatoriales, nul ne se souviendra plus de cette histoire. » (*Œuvres romanesques*, 286). Nous remarquerons ici, comme dans le roman précédent, un manque de communication et d’intérêt. Thérèse voudrait exprimer se sentiments mais elle se rend compte qu’on ne l’écoute pas. « Elle dit à voix basse : « J’ai tant souffert… je suis rompue… » puis s’interrompit : à quoi bon parler ? Il ne l’écoute pas ; il ne la voit plus. Que lui importe ce que Thérèse éprouve ? Cela seul compte : son ascension vers le sénat interrompue, compromise à cause de cette fille […]. » (*Œuvres romanesques*, 287-288). Les neuf premiers chapitres se déroulent pendant le trajet en voiture jusqu’à la maison à Argelouse. Pendant ce temps-là Thérèse revoit dans son esprit toute sa vie et prépare en même temps sa confession pour Bernard. Elle a passé son enfance avec sa meilleure amie Anne qu’elle aimait même si elles étaient totalement différentes. Elle s’est mariée plus tard avec Bernard, un homme très simple, un campagnard typique, que leurs parents lui ont choisi. À l’époque elle n’avait néanmoins rien contre ce mariage, cela lui était indifférent. Ce n’est qu’après qu’elle s’est rendue compte de l’étouffement que cette « prison » lui avait apporté. Elle était hypocrite avec Bernard, elle ne lui montrait pas ce qu’elle ressentait réellement et qu’il lui était souvent odieux. Pendant le voyage de noces elle feignait d’être heureuse et éprouver du plaisir. « Durant ce voyage aux lacs italiens, a-t-elle beaucoup souffert ? Non, non ; elle jouait à ce jeu : ne pas se trahir. Un fiancé se dupe aisément ; mais un mari ! N’importe qui sait proférer des paroles menteuses ; les mensonges du corps exigent une autre science. Mimer le désir, la joie, la fatigue bienheureuse, ce n’est pas donné à tous. » (*Œuvres romanesques*, 302). Plus tard elle est tombée enceinte malgré le fait qu’elle ne désirait pas d’enfant, c’était pour elle un fardeau. Toute la famille a du coup commencé à s’intéresser à elle, mais ils ne s’intéressaient en réalité seulement qu’à l’enfant. C’est aussi à cette époque qu’elle a connu Jean Azévédo. C’était un jeune libertin d’une famille juive qui est venu à la campagne pour des raisons de santé. Anne est tombée amoureuse de lui et la famille a chargé Thérèse de la décourager de cette relation. Finalement, Anne a été par force emmenée ailleurs et plus tard elle s’est mariée avec l’homme qu’on lui avait choisi. Mais Thérèse, à son tour, fut passionnée par Jean. Elle admirait sa jeunesse et son attitude libertine envers la vie, ainsi que ses réflexions philosophiques. Elle mettait beaucoup d’espoir dans ce garçon, qui est pourtant parti pour Paris et dont elle n’avait plus de nouvelles. À la maison, avec Bernard, elle souffrait et elle étouffait car ils n’avaient rien à se dire. Elle aspirait à des choses plus profondes alors que lui était borné, se cantonnait dans sa vie quotidienne. Tout cela l’a poussé jusqu’à la tentation de l’empoisonner à l’arsenic. Devant le tribunal, la famille camoufle l’affaire, comme nous l’avons déjà mentionné précédemment. Quand Thérèse arrive à Argelouse, c’est la grande désillusion. Elle ne peut rien dire de ce qu’elle préparait pendant tout son trajet. Elle était décidée à tout lui dire, elle préméditait chaque mot, et même si elle avait peur qu’il ne la comprenne pas, elle se convainquait du contraire. Mais Bernard ne veut rien entendre, il se comporte comme un dictateur. Il pense en plus qu’elle voulait le tuer pour des raisons cupides, pour que tous ses pins lui soient échus. Il ne la comprend pas, il n’en est pas capable à son niveau d’esprit. Il lui impose des règles qu’elle devra désormais suivre. Thérèse se rend compte combien elle était naïve. « Les êtres que nous connaissons le mieux, comme nous les déformons dès qu’ils ne sont plus là ! Durant tout ce voyage, elle s’était efforcée, à son insu, de recréer Bernard capable de la comprendre, d’essayer de la comprendre ; - mais du premier coup d’œil, il lui paraissait tel qu’il était réellement […]. » (*Œuvres romanesques,* 336). Elle se sent désormais encore plus en prison qu’avant, elle songe même à se suicider, mais les circonstances ne lui permettent pas de le faire. Puis les deux déménagent dans la maison de Bernard (ils habitaient auparavant dans sa maison à elle) et leur fille Marie est envoyée loin de Thérèse pour être « protégée ». Depuis Thérèse ne sort plus, elle reste toujours au lit, elle ne mange presque plus et ne fait que fumer. Elle réfléchit sur le passé ou rêve et invente une autre vie où elle serait heureuse et où elle aurait l’amour. Elle devient malade. À la fin Bernard a peur pour elle, il veut qu’elle guérisse et il décide de la libérer. Il lui dit qu’il faut seulement attendre le mariage d’Anne, pour que tout le monde les voie encore une fois ensemble, et puis elle sera libre. « Les deux époux s’étonnaient de ce qu’entre eux subsistait si peu de gêne. Thérèse songeait que les êtres nous deviennent plus supportables dès que nous sommes sûrs de pouvoir les quitter. » (*Œuvres romanesques*, 356). Il l’accompagne après à Paris où elle doit commencer une nouvelle vie. Enfin, Bernard lui pose une question afin de savoir pourquoi elle a essayé de l’empoisonner et il lui donne un peu d’espace pour parler. Puis il la laisse et repart dans les Landes.

## Le Nœud de vipères

Le troisième selon l’ordre chronologique est le roman *Le Noeud de vipères*. C’est le chef-d’œuvre de l’auteur dont le titre provisoire était *Le Crocodile*. Le titre final provient de la façon dont le personnage principal parle de son cœur : « Je connais mon cœur, ce cœur, ce nœud de vipères : étouffé sous elles, saturé de leurs venin, il continue de battre au-dessous de ce grouillement. » (*Œuvres romanesques*, 562). Ce roman, de même que le précédent, est introduit par une citation provenant cette fois de Sainte Thérèse d’Avila : « Dieu, considérez que nous ne nous entendons pas nous-mêmes et que nous ne savons pas ce que nous voulons, et que nous nous éloignons infiniment de ce que nous désirons ». (*Œuvres romanesques*, 491). Cette citation nous esquisse d’une partie la thématique du roman : la recherche du bonheur et l’impossibilité de le trouver car l’on ne le cherche pas au bon endroit. D’autres motifs importants sont la solitude, l’hypocrisie, l’avarice, l’argent et le manque de communication, ainsi que le Dieu et la foi. Le personnage principal s’appelle Louis et c’est un homme âgé dont la fin s’approche. Après Thérèse Desqueyroux, c’est encore un autre personnage monstre de Mauriac. Il est très avare et chérit beaucoup son argent. Il ne le dépense pas et ne donne rien à personne. Pendant toute sa vie il désirait prendre sa revanche sur sa famille qu’il haïssait et dont il se sentait haï. Il se réjouissait à l’idée qu’après sa mort, quand ils iraient chercher l’héritage à la banque, ils trouveraient le coffre vide. Il y aurait seulement une lettre adressée à sa femme Isa, dans laquelle il s’explique de toute sa haine. À la fin il a néanmoins changé, son obsession de vengeance a fondu et il a décidé de tout leur donner. Le roman que nous lisons est en effet cette lettre écrite à la première personne. Il est divisé en vingt chapitres regroupés en deux parties. Louis y avoue tous ses sentiments, tous ses défauts, récapitule sa vie depuis l’enfance. Il était un enfant ambitieux qui ne jouissait pas de la vie et qui, au lieu de jouer, travaillait dur à l’école afin d’entrer à l’École Normale et s’assurer des succès pour l’avenir. Une maladie lui a néanmoins empêché d’y entrer. Il avait une relation très proche avec sa mère qui le gâtait et qui l’étouffait un peu aussi, mais qu’il aimait beaucoup. Plus tard il a rencontré Isa qui venait d’une famille très riche et respectée, et c’était alors pour lui et aussi pour sa mère l’honneur qu’il allait épouser. Ils étaient au début heureux, ils se parlaient beaucoup, ils avaient fait le serment de tout se dire. Mais une fois Isa lui a avoué qu’elle avait aimé un autre avant, et encore par la suite, quand elle a connu Louis. Cela signifiait pour Louis une grande trahison et humiliation, même si Isa ne s’en rendait pas du tout compte. Nous pouvons remarquer sur ce point une similarité entre leur cas et le cas de Paul est Lucie Courrèges. « Il est étrange de penser que tu n’en as peut-être pas gardé le souvenir. Ces quelques heures de tièdes ténèbres, dans cette chambre, ont décidé de nos deux destins. Chaque parole que tu disais les séparait un peu plus, et tu ne t’es aperçue de rien. » (*Œuvres romanesques*, 517). Depuis, ces confidences se sont terminées et une époque de silence a commencé. « Alors s’ouvrit l’ère du grand silence qui, depuis quarante ans n’a guère été rompu » (*Œuvres romanesques*,524). « Pendant ces quarante années où nous avons souffert flanc à flanc, tu as trouvé la force d’éviter toute parole un peu profonde, tu as toujours tourné court. » (*Œuvres romanesques*,499). La haine est née en Louis. Elle s’est encore renforcée avec l’arrivée des enfants, parce qu’Isa ne s’intéressait presque plus à lui et s’occupait seulement des petits. Louis n’aime même pas ses enfants, quand il s’adresse à Isa il utilise le terme « tes enfants », il pense que la seule chose qu’ils veulent de lui est l’argent. Parfois il les écoute en cachette et il entend ce qu’ils se disent. Il est vrai qu’ils parlent de lui parfois assez méchamment, même si devant lui ils font semblant de l’aimer et s’intéresser à lui. Louis non plus ne dit pas ce qu’il pense. Il y a beaucoup d’hypocrisie des deux côtés. Ils se surveillent mutuellement. « J’entends votre troupeau chuchotant qui monte l’escalier. Vous vous arrêtez ; vous parlez sans crainte que je m’éveille (il est entendu que je suis sourd) ; je vois sous la porte la lueur de vos bougies […] Tu les grondes ; tu vas leur dire : je vous assure qu’il ne dort pas… » Tu t’approches de ma porte ; tu écoutes ; tu regardes par la serrure : ma lampe me dénonce. » Louis est quasiment toujours seul et il analyse le comportement des autres, cherche à comprendre leur complot, il est souvent paranoïaque. Il analyse aussi sa propre âme et tous ses défauts. Il ne s’aime pas, il se voit lui-même comme un monstre. Dans sa vie il y a néanmoins eu quelques personnes qu’il a aimées. C’était d’abord sa mère, comme nous l’avons déjà mentionné, puis Marinette, la sœur d’Isa. Elle avait une trentaine d’années quand son vieux mari est mort. Elle devait hériter d’une fortune, mais seulement à condition de ne jamais se marier à nouveau. Toute la famille souhaitait qu’elle reste dans le célibat et elle s’est révoltée, car pour elle le bonheur comptait plus que l’argent. Finalement elle est partie, elle s’est remariée puis est morte à l’accouchement. Elle a laissé un fils, Luc, que Louis beaucoup aimé selon ses propres mots parce qu’il ne se retrouvait pas en lui. « Puis-je dire que je l’ai chéri comme un fils ? Non, car ce que j’aimais en lui, c’était de ne m’y pas retrouver. » (*Œuvres romanesques*,558). Par contre, Isa n’appréciait pas cet enfant. Louis songeait à laisser son héritage à Luc, mais celui-ci est mort dans la guerre, encore adolescent. Louis avait également une fille, Marie, dont il était proche, et elle aussi est morte encore enfant. « J’avais le sentiment irrésistible d’un départ, d’une absence […] Plus tard tu m’as accusé d’oublier vite. Je sais pourtant ce qui s’est rompu en moi lorsque je l’ai embrassé une dernière fois, dans son cercueil. » (*Œuvres romanesques*,552). Puis il avoue dans sa lettre qu’il avait une maîtresse qui lui a donné un fils. Même si le plus souvent il parle à Isa avec haine, il y a des moments où il exprime le souhait de recommencer à communiquer, de se réconcilier. À la fin Isa tombe gravement malade. Les deux époux se disent finalement ce qu’ils cachaient dans leurs cœurs pendant des années, ils apprennent tous les malentendus, ils se rendent compte qu’ils ne savaient rien des sentiments de l’autre. « Pourquoi les détestes-tu, Louis, pourquoi hais-tu ta famille ? – C’est vous qui me haïssez. Ou plutôt, mes enfants me haïssent. Toi… tu m’ignores, sauf quand je t’irrite ou que je te fais peur. – Tu pourrais ajouter « ou que je te torture… » Tu penses que je n’ai pas souffert autrefois? – Allons donc ! Tu ne voyais que les enfants. – Il fallait bien que je me rattache à eux. Que me restait-il en dehors d’eux (et à voix plus basse), tu m’as délaissée et trompée dès la première année, tu le sais bien […] Mes enfants ! Quand je pense qu’à partir du moment que nous avons fait une chambre à part, je me suis privée, pendant des années, d’en avoir aucun avec moi, la nuit, même quand ils étaient malades, parce que j’attendais, j’espérais toujours ta venue. » (*Œuvres romanesques*, 580). Louis décide de laisser à Isa son argent, mais en ce qui concerne la propriété, il veut la vendre et donner cet argent à son fils inconnu. Il dit aussi : « Dans un soir d’humilité j’ai comparé mon cœur à un nœud de vipères. Non, non : le nœud de vipères est en dehors de moi ; elles sont sorties de moi et elles s’enroulaient, cette nuit, elles formaient ce cercle hideux au bas du perron, et la terre porte encore leur traces. » (*Œuvres romanesques*, 581). Il rencontre le fils de sa maîtresse et lui confie son plan. Mais celui-ci le déçoit, il le trahit et révèle ses intentions à la famille de Louis. En plus, Louis est dégoûté par cet homme, justement parce qu’il se reconnaissait trop en lui. Finalement, Isa meurt et Louis se rend compte que toute sa confession a été écrite en vain, qu’elle ne la lira jamais. À la fin de sa vie il change, il éprouve une envie de comprendre les autres, il ne les hait plus. Il s’occupe de sa petite fille Janine, abandonnée par son mari Phili. C’est elle qui essaye après sa mort de convaincre la famille qu’il était bon est plein de foi. Louis a pendant toute sa vie critiqué la façon dont les autres pratiquaient la religion. Il se prenait pour un athée, mais il avait en lui peut-être plus de foi qu’eux. Il leur reprochait la bassesse avec laquelle ils abordaient le Dieu, qu’ils lui demandaient des choses matérielles et futiles. « Tu ne pressentais pas l’irritation qu’éveillaient en moi de telles paroles. Vos adversaires se font en secret de la religion une idée beaucoup plus haute que vous ne l’imaginez et qu’ils ne le croient eux-mêmes. Sans cela, pourquoi seraient-ils si blessés de ce que vous la pratiquez si bassement ? À moins qu’il paraisse si simple à vos yeux de demander même des biens temporels à ce Dieu que vous appelez Père ? » (*Œuvres romanesques*,521). Après la mort de Marie il disait à propos de sa femme Isa : « L’Abbé Ardouin te relevait, te parlait de ces enfants à qui il faut ressembler pour entrer dans le royaume du père : « Elle est vivante, elle vous voit, elle vous attend. » Tu hochais la tête ; ces mots n’atteignaient même pas ton cerveau, ta foi ne te servait a rien. » (*Œuvres romanesques*,552). Il critiquait aussi sa manière de faire les bonnes actions qui était vraiment paradoxale : elle donnait de l’argent aux mendiants mais elle ne voulait jamais augmenter le salaire de ses pauvres domestiques en disant qu’ils ont tout dont ils ont besoin et elle négociait pour le moindre sou avec la pauvre vendeuse de légumes. Dans cet aspect le point de vue de Louis était plus objectif que celui des autres. C’est peut-être aussi grâce à ces réflexions qu’à la fin il retrouve la véritable foi. Les dernières lignes de sa lettre sont les suivantes : « Ce qui m’étouffe, ce soir, en même temps que j’écris ces lignes, ce qui fait mal à mon cœur comme s’il allait se rompre, cet amour dont je connais enfin le nom adoré… » (*Œuvres romanesques,* 623).

**Conclusion :**

Les quatre romans que nous traitons dans ce travail ont plusieurs grands thèmes en commun qui sont la critique sociale, la critique de la religion, les lutte intérieures des personnages, leurs relations et la communication entre eux. Les motifs les plus courants sont le désir de l’argent, le sentiment de solitude et de désespoir, la passion, le silence et le manque de communication.

Tous ces motifs aboutissent à la problématique que nous avons remarqué dans notre travail : la liberté et la dépendance.

Ces deux mots ont plusieurs significations et peuvent être envisagés de différents points de vue. Nous pouvons surtout distinguer deux aspects opposés : intérieur et extérieur. Les libertés et les dépendances extérieures concernent notre existence dans le monde matériel, tandis que les libertés et les dépendances intérieures sont liées à notre état d’esprit. Ces deux aspects peuvent exister l’un à coté de l’autre, c'est-à-dire qu’une personne peut être libre à l’intérieur sans être libre dans le sens matériel, et inversement.

Nous pouvons constater que François Mauriac était lui-même dépendant, surtout de la région de Bordeaux où il est né, puis de sa mère et aussi du fait d’écrire et de la vision de devenir écrivain. Dans son œuvre nous retrouvons certains éléments autobiographiques, même si l’auteur lui-même prétend que ses personnages ne sont pas liés à lui, qu’ils vivent leur propre vie.

En ce qui concerne les personnages de Mauriac, nous les avons classés dans cinq catégories. Ce sont d’abord les femmes de famille, un groupe de personnages stéréotypés à l’esprit plutôt simple qui se limitent à leurs occupations quotidiennes. Leurs principales dépendances sont la propriété, la réputation familiale et leurs enfants. Suivent les femmes singulières qui ont au contraire une psychologie plus complexe et qui s’opposent aux stéréotypes de la société. Puis ce sont les garçons adolescents qui se distinguent beaucoup entre eux, mais qui ont en commun surtout la passion envers les filles. Ils sont souvent dépendants de leur succès et de leur réputation. Dans la quatrième catégorie se trouvent les pères de famille. C’est une catégorie très hétérogène. Il s’agit de personnages ouverts et amicaux ainsi que ceux qui sont, au moins au premier regard, antipathiques. Certains sont dépendants de l’argent, d’autres de leur carrière ou encore des femmes. À la fin nous avons présenté les maris, ce qui est une catégorie plutôt marginale. Il s’agit des personnages moins développés au niveau de la psychologie et qui donnent l’impression d’être plutôt bornés d’esprit. Ils peuvent être dépendants de leur réputation, de leur propriété, des femmes et du confort.

Nous avons divisé les dépendances présentes chez les personnages mauriaciens en trois groupes principaux : les dépendances physiques, les dépendances aux choses matérielles et aux choses non matérielles. Nous avons surtout développé les deux dernières, qui sont plus fréquentes dans les romans. Les personnages sont dépendants de l’argent, de la propriété et du confort en ce qui concerne les choses matérielles et au succès, à la réputation, de leurs visions et des gens en ce qui concerne les choses non matérielles. La première cause de toutes les dépendances est la recherche du bonheur. Elle se transforme ensuite en passion, peur, jalousie, haine et d’autres sentiments qui représentent également les conséquences des dépendances. Tout cela mène dans certains cas extrêmes jusqu’à un crime.

En comparant les romans avec la situation contemporaine nous avons constaté que beaucoup de dépendances qu’ont les personnages mauriaciens sont aujourd’hui toujours actuels : les dépendances à l’argent, à la réputation, aux gens et encore d’autres limitent encore la liberté des gens.

**Bibliographie :-**

**1)** Mauriac, François, *Thérèse Desqueyroux*, *Noeud de vipères*, *Désert de l’amour*. *Oeuvres romanesques*, édition présentée et annotée par Jean Touzot. Paris: Librairie générale française, 1992.

2)Hatzfeld,Helmut,*Trends and styles in Twentieth Century French Literature*,Washington D.C. :The Catholic University of America Press,1957.

3) Cormeau, Nelly, *L’Art de François Mauriac*,Paris : Bernard Grasset Éditeur, 1951.

4)Pell,Elsie,*François Mauriac :In Search of the Infinite*,New York :Philosophical Library,1947.

5) La Garde,André and Laurent Michaud,*XXeme siècle*,Paris :Éditions Bordas,1962.